হযরত

শাহজালাল (রহ.)

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

হযরত শাহজালাল (রহ.) • মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

JP

হযরত শাহজালাল (রহঃ)

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

Md. Shafiul Alam

JP
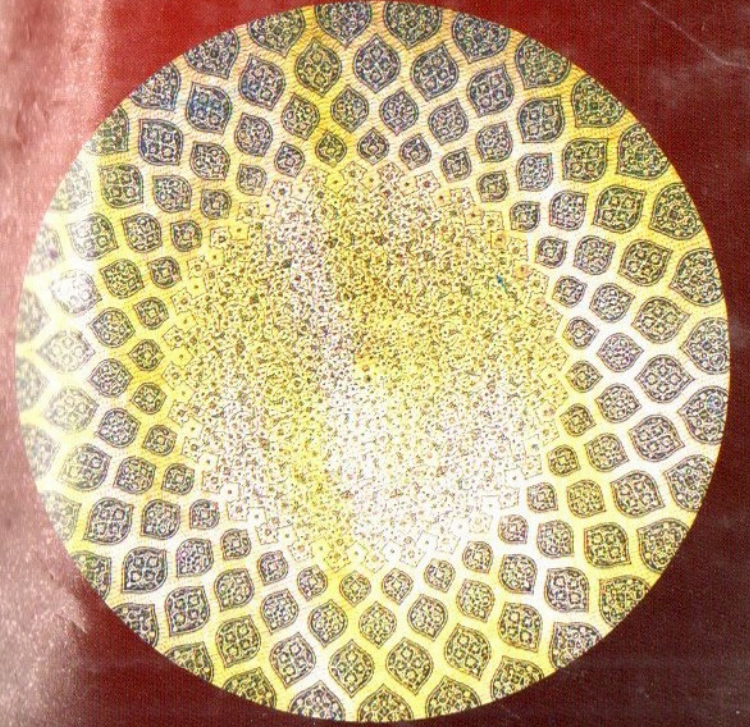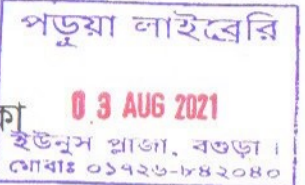
জয় প্রকাশন ॥ ঢাকা

JP
পুনঃ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক
জয় প্রকাশন
৩৮/২-খ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
০১৭১২২৬৮৯৫১
০১৯১৫৬৩৩৯৪৫

অক্ষরবিন্যাস
আনন্দ কম্পিউটার্স
বরিশাল-৮২০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মূল্য
১০০.০০ টাকা

ISBN 984-70154-0120-7

অনলাইনে বই কিনতে
rokomari.com/joyprokashon
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হটলাইন ১৬২৯৭

আমার ব্যক্তিগত কথা

বিখ্যাত মহাপুরুষরাও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তাই বিগত দিনের মহাপুরুষদের জীবনচরিত লিখতে গেলে ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। আলোচ্য জীবনচরিত গ্রন্থটি ইসলাম প্রচারক হযরত শাহজালাল (রহঃ)-কে নিয়ে লেখা। তার সম্পর্কে লিখিত কতিপয় গ্রন্থ থেকে এ লেখার তথ্য নেয়া হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, গ্রন্থান্তরে তথ্যাবলীতে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। এমনকি সন-তারিখ, স্থানের নাম, লোকের নামেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে হযরত শাহজালাল (রহঃ) নামে একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং তিনি শ্রীহট্টে এসে অত্যাচারী মুসলিম নির্যাতনকারী শাসক রাজা গৌরগোবিন্দকে শায়েস্তা করেন এবং সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন— এতে কা'রো দ্বিমত নেই। শ্রীহট্টে (সিলেট) তার দরগাহ এবং মাজার আজও বর্তমান রয়েছে এবং বহু দেশ-বিদেশী লোকজন প্রতিবছর এখানে জিয়ারতে আসছেন। আমি এসব ঘটনাবলী লিখতে গিয়ে একই বিষয়ের একাধিক তথ্য থেকে যেটি আমার ইচ্ছে হয়েছে সেটিই এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। আমি কোনো নতুন তথ্য সংযোজন কিংবা অতিরঞ্জন করিনি।

আমার এ গ্রন্থটি কিশোর পাঠ্য হিসেবে লেখা হয়েছে। তবে আশাকরি, এতে বড়দেরও চিন্তার খোরাক যোগাবে। এ গ্রন্থ পাঠে মহাপুরুষের জীবন চরিত সম্পর্কে জানা এবং তাতে কারো কোনো মংগল সাধিত হলে শ্রম সার্থক হবে।

হাবীবুর রহমান
১৫/৪/২০০৩ইং
গ্রাম+ডাক ঃ- রাজাবাড়ী
জিলা ঃ- পিরোজপুর—৮৫২২।

গ্রন্থকার পরিচিতি

নাম ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান।
পিতার নাম ঃ মৌলভী আহমদ আলী এফ. এম. (কলিকাতা)।
মাতার নাম ঃ মোসাম্মৎ হাকিমুন নেসা।
জন্ম ঃ ০১.১১.১৯৪১ ইং (সার্টিফিকেট অনুসারে)
জন্মস্থান ঃ পিরোজপুর জিলাধীন নাজিরপুর থানার লেবুজিলবুনিয়া গ্রাম।
বর্তমান বাসস্থান ঃ পিরোজপুর জিলাধীন নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) থানার রাজাবাড়ী গ্রামে।
পেশা ঃ শিক্ষকতা। এখন অবসর জীবন।
নেশা ঃ ছেলেবেলা থেকেই একমাত্র সাহিত্য চর্চা।
প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ঃ সাহিত্য ২২; ক্লাশ পাঠ্য ৫।
অপ্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ঃ পঞ্চাশের উর্ধে।
লেখালেখির বিষয় ঃ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, ক্লাশপাঠ্য ইত্যাদি।
সম্পাদিত এবং প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা ঃ—'নবারুন' (১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়); 'নতুন মুখ' (১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত); 'কালান্তর' (১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত এবং এখনও প্রকাশিত হয়।)
মাসিক পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশ ঃ—১৯৫০ সালে 'জন্মভূমি' নামে কবিতা ফরিদপুরের মাসিক 'সেবা' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ ঃ ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ছুটির দিনে' নামে শিশু নাটিকা প্রকাশ করে বরিশাল শহরের কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী।
যে সকল পত্র-পত্রিকায় লেখেনঃ—'পরওয়ানা'—ঢাকা; 'মুঈনুল ইসলাম', 'আত্‌তাওহীদ', 'দাওয়াতুল হক'—চট্টগ্রাম; 'মারজান'—সিলেট; 'তাবলীগ' 'কুঁড়িমুকুল'—ছারছিনা, নেছারাবাদ, পিরোজপুর; 'পিরোজপুরের খবর' (সাপ্তাহিক); অতীতে 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ'; 'আজকের কাগজ' (দৈনিক); 'ভোরের কাগজ' (দৈনিক); 'সংবাদ' (দৈনিক); 'প্রথম আলো' (দৈনিক); 'বই (মাসিক); 'গণশিক্ষা' (পাক্ষিক); অনূক্ত (মাসিক); 'মনোরমা' (সাপ্তাহিক); 'কিশোর মাসিক নবারুন' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। এছাড়া আরও কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখতেন এবং এখনও লিখছেন।
সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রাপ্তি ঃ ১৯৮৮ সালে পিরোজপুর জিলার সাপ্তাহিক দর্পণ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ, ১৯৯০ সালে পিরোজপুরের গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি কর্তৃপক্ষ, ১৯৯৯ সালে ঢাকাস্থ স্বরূপকাঠী যুব সমিতি এবং বাংলাদেশ লেখক আইনজীবী সংসদ ঢাকা কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনা এবং পুরস্কার প্রদান করেন। তাছাড়া ২০০০ সালে দুটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০১ সালে একটি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন—স্থানীয় এবং ২০০৩ সালে ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত একাডেমীর মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কুঁড়িমুকুল' কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান করেন।

উৎসর্গ

আমার দৌহিত্র শাহরুখ ফয়সাল—
তার করকমলে হয়রত শাহজালাল।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান-এর গ্রন্থাবলী ঃ

উপন্যাস

* কেন সে আমার নয়
* কান্নার অবসান
* চিঠি লিখে যাই
* ভালোবাসা
* ফিরে আসা
* ভুল যখন ভাঙলো
* তকদীর
* কথা দিলাম
* পরশমণি
* জীবনের খস্ড়া

গল্প

* ইয়োরোপীয়ান লেডী

নাটক

* দিল্লী অধিকার
* জনসেবার লগ্নীকারবার

কাব্যগ্রন্থ

* কিছু সাধ কিছু আশা
* আরণ্যক শ্বাপদের প্রতি

ঐতিহাসিক আলোচনা

* মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি
* বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম
* আমাদের ভাষা আন্দোলনের কথা

সাহিত্যালোচনা

* রবীন্দ্র প্রসঙ্গ
* নজরুল প্রসঙ্গ

রম্য রচনা

* আদম আলীর-উপাখ্যান
* ইবলিসের সঙ্গে কিছুক্ষণ

প্রবন্ধ
* সাহিত্য কথা
* বিবিধ ভাবনা

শিশু কিশোর সাহিত্য
* শিয়াল পণ্ডিতের কিণ্ডারগার্টেন
* ছুটির দিনে
* গল্পে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
* রঙ বেরঙের রম্য কথা
* হবু চন্দ্রের কিস্‌সা
* কল্প কথার গল্প
* রাজার জন্য নাসিকা

জীবনচরিত
* আমাদের মহানবী (সাঃ)
* হযরত ঈসা (আঃ)
* খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ)
* ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ)
* হযরত শাহজালাল (রহঃ)

ইসলামী সাহিত্য
* মঞ্জিলে মকসুদ
* শয়তানের সহচরী
* শেকড়ের সন্ধানে
* হালযামানার হাল-হকিকাত
* প্রসঙ্গ নারীবাদ
* সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে
* অথবুদ্ধিজীবী সমাচার
* তালিকার ২২টি গ্রন্থ প্রকাশিত এবং কয়েকটি প্রকাশের পথে।

সূচিপত্র

প্রাসঙ্গিক কথা

ভারতবর্ষ। একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানকার অধিবাসীরা শারীরিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় দিক দিয়ে বিভিন্ন। এখানকার ভূমির গঠন, আবহাওয়া, প্রকৃতি এলাকা বিশেষে ভিন্নতর।

কোথায়ও তার ধুম্র পাহাড়
কোথায়ও বন, সাগর-নদী।
কোথায়ও শস্য শ্যামলা মাঠ
কোথায়ও পুষ্প, বনৌষধি॥

গ্রীক বীর আলেকজান্ডার একদা ভারত বিজয়ে এসে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তার সেনাপতি সেলুকাসকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :—'কী বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!'

আমাদের বাংলা ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ এ দেশের জনগুষ্ঠি সম্পর্কে লিখেছেন :—

'কেহ নাহি জানে, কার আহবানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুনদল মোগল পাঠান একদেহে হল লীন।'

ভারতের প্রাচীন অধিবাসীরা সভ্য ছিল না। তারা ছিল আকৃতিতে খর্ব এবং কদাকার। সম্ভবতঃ তাদের কোন ধর্মও ছিল না। তারা কোথা থেকে কীভাবে এসে এখানে বসবাস শুরু করে, তা জানা যায় না। শুধু বলা হয়, এরা ভারতের আদিবাসী। এদের পরে অপেক্ষাকৃত সভ্য এক জাতি ভারতে বসবাস করে। তারা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। এদেরকে বহিরাগত বলা হয়। অতঃপর যে সভ্য জাতি ভারতে প্রভুত্ব বিস্তার করে, তারা আর্য নামে কথিত। আর্যরা দীর্ঘাকৃতি এবং সুদর্শন ছিল। এদের আদি বাসস্থান ছিল পারস্যদেশে। সেখান থেকে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে এরা ভারতে

প্রবেশ করে। ভারতে এলে তাদের সংগে প্রাচীন অধিবাসীদের (আর্যদের ভাষায় তারা অনার্য নামে আখ্যায়িত) সংঘাত শুরু হয়ে যায়। অনার্যরা পরাভব স্বীকার করে। তারা আর্যদের দাসে পরিণত হয়।

আর্যরা ছিল বহুত্ববাদী। তারা 'বেদ' নামে ধর্মশাস্ত্র রচনা করে। তাদের শাস্ত্র গ্রন্থ অনুসারে ধর্মের নাম হয় বৈদিক ধর্ম। 'বেদ' চারিভাগে বিভক্ত। তার পরেও আরো শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, যথা— উপনিষদ, স্মৃতি, শ্রুতি, সংহিতা, গীতা ইত্যাদি। শুধু এ পর্যন্তই নয়। তারপরেও রয়েছে পুরাণ, উপ-পুরাণ যথা— চণ্ডী, ভাগবত, কূর্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। এভাবে তাদের ঈশ্বরও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি তিন শক্তিতে বিভক্ত হয়। তার উপরে ব্রহ্মের অবস্থান এতদ্সত্ত্বেও বেদ বলে— 'এক মেবা দ্বিতীয়ম্।' কিন্তু তথাপি কোন একক Supreme Power-এর ঈশ্বর এধর্মে পাওয়া যায় না। সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতাধর। তারপরেও আছে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী। আবার যুগে যুগে অবতীর্ণ ঈশ্বরেরা কম শক্তিশালী নয়। এভাবে অযোধ্যার রাজ পুত্র (পরে রাজা) রামচন্দ্র, মথুরার রাজা (প্রথমে রাজার ভাগ্নে, পরে মাতুলকে হত্যা করে সিংহাসন দখল) শ্রীকৃষ্ণ, কলিকালে নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত (শ্রী চৈতন্য) ঈশ্বর হয়ে বসেন। আর, বুদ্ধ (সিদ্ধার্থ, কপিলাবস্তুর রাজপুত্র) ঈশ্বর হয়েছেন বটে, তবে বৈদিক (হিন্দু) থাকতে পারেননি, তিনি বৌদ্ধ হয়ে গেছেন। ভারতে এ রকমের ঈশ্বর আরও আছেন।

আর্যরা বর্ণবৈষম্যের পত্তন করলেন। যারা বুদ্ধিমান এবং কৌশলী তারা হলেন ব্রহ্মার উত্তমাংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। পূজা-পার্বন, অধ্যাপনার দায়িত্ব তাদের উপরে ন্যাস্ত থাকলো। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার জন্য একদল যোদ্ধা শ্রেণীর আবশ্যক হলো। সৃষ্টি করলেন ক্ষত্রিয় শ্রেণী। তারপর আহার্য যোগাড়ের জন্য আবশ্যক হলো উপার্জনশীল একটা শ্রেণীর। তাদেরকে বলা হলো বৈশ্য। এরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করবেন। এখন একদল সেবাদাস হলেই সবদিক রক্ষা হয়। পরাজিত অনার্যদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করা হলো শূদ্র। বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ এবং সর্ব

নিকৃষ্ট শ্রেণীটি শূদ্র। সবাইকে সবার প্রয়োজন থাকলেও একসংগে পংক্তিভোজন করা হলো নিষিদ্ধ। তাও আবার এ রকম যে, ব্রাহ্মণের ছোঁয়া খাদ্য সবাই খেতে পারবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কারো ছোঁয়া খাদ্য খাবেন না। আর, শূদ্রতো বেদ অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং স্পর্শ করবার অধিকার থেকেও থাকলো বঞ্চিত। অথচ সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি, এটা বৈদিকেরাও মানেন। তবে অস্পৃশ্যতা থাকবে কেন আর লোকে তা' মানবেই বা কেন? এজন্য শাস্ত্র রচনা আবশ্যক। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শোনানো হলো:—

'চাতুর্বন্যংময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশ!।'

ব্যস, লাঠা চুকে গেল। সবাই নমঃ-নমঃ করে ব্রাহ্মণ—বাক্য মেনে নিল। তাই বলা যায়, বৈদিক (হিন্দু) ধর্ম মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ব্রাহ্মণ অগ্রাহ্য করলে এ ধর্মের আর অস্তিত্ব থাকে না।

ভারতের আদিবাসীরা আর্যদের কাছে অস্পৃশ্য হলেও, তারা অনেকেই আর্যদের ধর্ম মেনে নিলো। আর, বৈদিক আর্য ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে যাগ-যজ্ঞ সিঁকেয় তুলে রেখে বারো মাসে তেরো পূজার ব্যবস্থা করলো। কেননা, তা' না হলে ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা বাড়ে না। এই ভারতের হিংসুক বর্ণবাদী বহু দেবতার উপাসক মহামানবদের সহাবস্থানে আরবীয় তৌহিদবাদী মুসলমানরা কী করে এলো, এবার তা-ই বলছি।

আরবীয় খেলাফতের খলিফা উমাইয়া বংশের প্রথম ওয়ালিদ-এর শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রীস্টাব্দ) ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তৎকালে আরবীয় বণিকেরা ভারতে আসতেন বাণিজ্য করতে। সিন্ধুর দেবল বন্দরের কাছে আরবীয় বণিকদের জাহাজ জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। তখন সিন্ধুর হিন্দু রাজার নাম ছিল দাহির। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরকে জলদস্যুদের দমন এবং লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারের জন্য অনুরোধ জানান। রাজা অসম্মতি জ্ঞাপন করলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা মুহাম্মদ বিন কাশিম। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত এবং নিহত হলে সিন্ধু দেশ মুসলমানদের অধিকারে

আসে। মুহাম্মদ বিন কাশিম উদার মনোভাব নিয়ে রাজা দাহিরের আমত্যবর্গের সহযোগিতায় রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তার সুশাসনে আমত্যবর্গ এবং প্রজাকূল সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তবুও তো মুসলিম শাসন। ষড়যন্ত্র চলতে থাকলো। এক সময়ে দাহিরের কন্যারা মুহাম্মদ বিন কাশিমের চরিত্রে দোষারোপ করে আরবীয় খলিফার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশ্য তা ছিল একদম মিথ্যা। সেই অভিযোগে বিন কাশিম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

সেকালে ভারতবর্ষ ছিল কতকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত। তন্মধ্যে দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ ছিলেন বেশ শক্তিশালী। গজনীরাজ মোহাম্মদ ঘোরী ১০৯১ খ্রীস্টাব্দে চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করেন। তুরাইন নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ঘোরী পরাজিত হন। ১০৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি আবার দিল্লী আক্রমণ করেন। এবার পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হলে দিল্লী-আজমীর ঘোরীর করায়ত্ব হয়। সেনাপতি কুতুবুদ্দীনকে বিজিত রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব দিয়ে ঘোরী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবেই ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। অতঃপর ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বিহার ও বঙ্গদেশ বিজিত হয়।

ভারতে মুসলমান শাসকগণ অস্ত্রবলে এবং কতকটা উদারনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। এভাবেই ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্ সুদৃঢ় হয়। কিন্তু শাসক শ্রেণী কখনও ধর্ম (ইসলাম) প্রচারের চেষ্টা করেননি। সম্ভবতঃ তারা ভেবেছিলেন যে, ধর্মীয় আগ্রাসন হিন্দু ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, ভারতীয় হিন্দুরা স্বধর্মের মধ্যেও ছিলেন বর্ণবৈষম্যে আক্রান্ত। অন্যধর্ম, তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। তদুপরি ইসলাম ছিল সম্পূর্ণরূপে বৈদিক ধর্মের বিপরীত। যা-ই হোক, মোহাম্মদ ঘোরীর দিল্লী বিজয়ের কিয়ৎকাল পূর্বেই সুফীসাধক খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) কতিপয় অনুসারীসহ আজমীরে এসে আস্তানা গাড়েন। ভারতে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচার তিনিই শুরু করেন।

ইতোমধ্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুফীসাধকদের ধর্মপ্রচার অনেকটা সহজসাধ্য হয়। অতঃপর হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর আগমন ঘটে একসময়ে। তিনি তৎকালীন শ্রীহট্ট রাজ্যে আগমন করে সেখানে আস্তানা গাড়েন। এক্ষণে হজরত শাহজালাল (রহঃ)-এর আগমন এবং ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বলা হবে। তৎপূর্বে তার জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর জন্ম এবং প্রাথমিক জীবন

আরব জাহানের অন্তর্গত ইয়ামেন-এর করণ নামক গ্রামে ১৩২২ খ্রীস্টাব্দে ওলিকূল শিরোমণি হযরত শাহজালাল (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ মাহমুদ কোরায়েশী। তার পিতার নাম মতান্তরে মুহম্মদ কোরায়েশীও বলা হয়। অবশ্য মহমুদ এবং মুহম্মদ-এ খুব একটা তফাৎ নেই। তিনি কোরায়েশ বংশীয় ছিলেন বলে নামের শেষে কোরায়েশী বলা হয়। শেখ মাহমুদ কোরায়েশী একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন। তার দৈহিক শক্তি, সাহস ও বীরত্বের খ্যাতিও ছিল।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) জন্মকাল নিয়ে মতভেদ আছে। জন্মস্থান সম্পর্কেও ভিন্নমত রয়েছে। তার পিতা ইয়ামেন থেকে তুরস্কে চলে আসেন। এখানেই তার জন্ম হয়। এই তথ্যটি খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাঁর নামের সংগে 'ইয়ামেনী' শব্দটার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সেমতে ইয়ামেনে তার জন্ম, এটাই অধিক প্রামাণ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য।

শাহজালাল (রহঃ)-এর তিন মাস বয়ক্রম কালে তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার তত্ত্বাবধানেই তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। তার যখন বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তখন তার পিতা কাফিরদের সংগে এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন এবং শহীদ হন। তার মামা সৈয়দ আহমদ কবীর (মতান্তরে সৈয়দ কবীর আহমদ) এই ইয়াতিম শিশুটিকে নিজের কাছে নিয়ে যান। অতঃপর মামার তত্ত্বাবধানে তিনি পালিত হন।

সৈয়দ আহমদ কবীর একজন সুফী সাধক ছিলেন। তিনি তরীকার অন্তর্গত ছিলেন, তার নাম সোহরাওয়ার্দীয়া। এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন

শেখ আবু নজীব সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হাদিসী বিশারদ ছিলেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম শিহাব উদ্দীন সোহাওয়ার্দী (রহঃ)। সৈয়দ আহমদ কবীর শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর মুরিদ ছিলেন এবং তার কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন।

সৈয়দ আহমদ কবীর যেমন ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম, তেমনি একজন কামেল পীরও ছিলেন। তিনি তার ভাগ্নে বালক শাহজালালের প্রাথমিক শিক্ষা দান নিজেই করেছিলেন। তার অনেক মুরীদ থাকায় তাদেরকে ইল্‌মে মারেফত শিক্ষা দিতে অনেক সময় ব্যয় হতো। তাছাড়া ওয়াজ-নছিহাত করেও সময় কাটাতেন। এসব কারণে তিনি বালক শাহজালালের জন্য অধিক সময় দিতে পারতেন না। মেধাবী ভাগ্নেকে উপযুক্ত ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি গৃহশিক্ষক হিসেবে সুশিক্ষিত আলেম নিয়োগ করেন।

হযরত শাহজালাল বালক বয়সের মধ্যেই মামার কাছে প্রভূত দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা লাভ করেছিলেন। অতঃপর গৃহ শিক্ষকের কাছে তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। তার স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। অতি অল্প সময়ে তিনি দ্বীনী ইল্‌ম্ শিক্ষায় অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। তবুও যেন তার জ্ঞান তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। সর্বদা তাকে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতে দেখা যেতো। কিশোর সুলভ চাঞ্চল্য ছিল না তার। হাসি-তামাসা, খেলাধূলার ধার ধারতেন না তিনি। নিয়মিত ইবাদতে সময় কাটাতেন। মামা বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তাকে এখনই ইল্‌মে তাসাউফের সবক দেওয়া আবশ্যক।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর ইল্‌মে তাসাউফ শিক্ষা

কিতাবী শিক্ষাকে বলা হয় জাহেরী ইল্‌ম শিক্ষা। আর বাতেনী শিক্ষা হলো ইল্‌মে তাসাউফ। কিতাবী শিক্ষার জন্য কিতাবী বিদ্যায় পারদর্শী উস্তাদই যথেষ্ট। কিন্তু বাতেনী শিক্ষার জন্য যে উস্তাদের প্রয়োজন তার উভয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার মামার কাছে এবং গৃহশিক্ষকের কাছে কুরআন, হাদিস, ফিকাহর শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

এবার মামা তাকে ইল্‌মে তাসাউফের শিক্ষা দিলেন। এ শিক্ষাকে দীক্ষাও বলা হয়। এ শিক্ষা হলো আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা। এ জন্য চাই একাগ্রতা, ধৈর্য এবং অনুশীলন। তার মামা তাসাউফের উস্তাদ হিসেবে খুবই উপযুক্ত ছিলেন। মামার কাছ থেকে সবক নিয়ে তিনি তাসাউফের গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন।

কথিত আছে, একদিন হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর (রহঃ) তার হুজরাখানায় জিকির করছিলেন। এমন সময়ে জংগল থেকে একটি হরিণী এসে তার সামনে দাঁড়ালো। এই হরিণীর একটি বাচ্চা বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আরও দু'টি বাচ্চা আছে তার। সে দুটিকেও খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় হরিণীটি তার সাহায্য প্রার্থনা করছিল। এ সময়ে হযরত শাহজালাল মামার কাছে উপস্থিত ছিলেন। মামা তাকেই আদেশ করলেন হরিণীর ব্যাপারে উপযুক্ত ফয়সালা দিতে। মামার আদেশ পেয়ে শাহজালাল ছুটে গেলেন জংগলে বাঘের খোঁজে। হরিণীও সংগে গেল। মামা ভাবছিলেন— শাহজালালকেতো বাঘের কাছে পাঠানো হলো। কিন্তু বাঘতো তাকেও খেয়ে ফেলতে পারে। আবার সে যদি বাঘটিকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়, তবে সেটা হবে তার অপরাধ। কেননা অন্য প্রাণী মেরে খাবার অধিকার বাঘের আছে। এটা আল্লাহ তায়ালার বিধান।

শাহজালাল (রহঃ) যখন জংগলে পৌঁছলেন, তখন বাঘটি হরিণীর অন্য বাচ্চা দুটিকেও মেরে ফেলতে উদ্যত। তিনি সহসা বাঘের মুখে সজোরে একটা চপেটাঘাত করলেন। বাঘ থম্‌কে গেল। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে সে নিরবে চলে যায়। বাঘের শিক্ষা হলো যে, পশু শিকার করে আহার করবার অধিকার তার থাকলেও দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাকে হত্যা করা অন্যায়।

অতঃপর হযরত শাহজালাল (রহঃ) মামার কাছে ফিরে এলেন। তিনি জানতে চাইলেন বাঘের এবং হরিণীর কী ফয়সালা করেছেন। তিনি ঘটনাটি মামার কাছে বললেন। তিনি শুনে খুব খুশি হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার ভাগ্নে ইল্‌মে তাসাউফ শিক্ষায় কামইয়াব হয়েছেন। তাই বনের হিংস্র বাঘও তার ফয়সালা মেনে নিয়েছে।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর ভারতবর্ষে আগমন

হযরত শাহজালাল (রহঃ) বয়োপ্রাপ্ত হয়েও বিবাহের প্রতি আগ্রহী না হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। সংসারের কোনো বস্তুর প্রতি তাঁর লোভ-লালসা ছিল না। সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকতেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন— একজন শুভ্র পোষাক পরিহিত সুদর্শন ব্যক্তি তাঁকে বলছেন:— শাহজালাল, তোমার সাধনায় আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়েছেন। তুমি তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্গত হয়েছো। তোমাকে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমি তোমাকে হিন্দুস্থানে (ভারতবর্ষে) গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতে বলছি। সেখানে বহু মুশরিকের বসবাস। তারা আল্লাহর ইবাদত না ক'রে বহু দেব-দেবী, এমনকি পশুরও পূজা করে। তারা মূর্তির উপাসক। সেদেশে যে-সকল মুসলমান রয়েছে, তারা কাফিরদের ভয়ে ঠিক মতো ইবাদত করতে পারছে না। তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে। তুমি সেখানে চলে যাও। সেখানে যে-সব মুসলমান পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদেরকে দ্বীনের রাস্তায় ফিরিয়ে আনো। আর, কাফিরদেরকে সৎ ও সঠিক পথ দেখাও।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর স্বপ্ন তাকে চিন্তা ক্লীষ্ট করে তুললো। তিনি ভাবলেন, এই স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন নয়। এতে আল্লাহর ইংগীত রয়েছে। তিনি স্বপ্নের ঘটনা মামা সৈয়দ আহমদ কবীর (রহঃ)-কে জানালেন। তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন :— তোমার উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয়েছে। তোমার দ্বারা দ্বীন ইসলামের খিদমত হোক দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে, এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। তোমার এ স্বপ্ন তারই ইংগীতবাহী। তুমি হিন্দুস্থানে চলে যাও। আমিও তোমাকে তা-ই বলছি।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) বললেন :— আমিতো হিন্দুস্থান চিনি না। কোন্ পথ দিয়ে যেতে হয় তা-ও জানা নেই। কেমন করে যাবো?

সৈয়দ আহমদ কবীর (রহঃ) বললেন :— আমিও তো সে দেশ চিনি না। তবে নামটা শুনেছি। দেশের নাম ভারতবর্ষ। তাকে হিন্দুস্থানও বলা হয়। সেখানে মুসলমান বাদশাহর শাসন থাকলেও অধিকাংশ লোক

মুশ্‌রিক। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। সেদেশে অনেক রাজ্য এবং বহু রাজার শাসন।

সবাই মুসলমান বাদশাহর শাসন মানে না। যেখানে হিন্দু রাজার অধীন মুসলমান প্রজা বাস করে, তারা অত্যাচারিত হয়। ধর্ম-কর্ম ঠিকমতো পালন করতে পারে না। আর, মুসলমান শাসক বর্গও আল্লাহর দ্বীন-প্রচারে তৎপর নয়। সুতরাং তোমার সেখানে যাওয়া উচিত। আর, শুনেছি, এখান থেকে পূর্বদিকে সেই দেশটি। তুমি বিস্‌মিল্লাহ বলে পূর্বদিকে চলতে থাকো। আমি তোমাকে এক মুষ্টি মাটি দিচ্ছি। এই মাটি সংগে নিয়ে যাবে। তুমি যেখানে এরূপ মাটি পাবে, সেখানেই তোমার স্থায়ী আস্তানা করবে। কোনো চিন্তা করো না। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে পথ দেখিয়ে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) মামার দোয়া সম্বল ক'রে আল্লাহর নাম নিয়ে হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। কয়েকজন সফর সংগীও তার জুটে গেল। তিনি প্রথমে ইয়ামেনের রাজধানীতে উপনীত হলেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর বাগদাদে গেলেন। বাগদাদে কিছু দিন অবস্থান করেন। এখানে কিছু লোক তার মুরীদ হন। কিছু সংখ্যক মুরীদ তার সফরসংগী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাদেরকে সংগে নিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করে সমরকন্দ, আফগানিস্থান, গজনী ঘুরে ভারতের দিল্লীতে এসে পৌঁছেন। তখন দিল্লীতে হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার খান্‌কা ছিল। তিনি এই খান্‌কায় কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার সংগে তার বন্ধুত্ব হয়। তার কাছ থেকে তিনি ধূসর বর্ণের এক জোড়া কবুতর উপহার হিসেবে লাভ করেন। সেই কবুতরের বংশধর আজও বর্তমান। আমাদের দেশে তা জালালী কবুতর নামে খ্যাত।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার সফর সংগীদের নিয়ে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতে থাকেন। সর্বত্র তিনি তার মামার দেওয়া মাটির সংগে সাদৃশ্য যুক্ত মাটি অনুসন্ধান করেন। অবশেষে শ্রীহট্টে (সিলেট) এসে তিনি সদৃশ্যযুক্ত মাটি পেয়ে যান। তিনি এখানেই তার স্থায়ী আস্তানা গড়েন। শ্রীহট্ট তখন বংগদেশ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রকাশ থাকে যে, বিট্রিশ

শাসন-আমলে তা' আসাম প্রদেশের একটি জিলা এবং পাকিস্তানী শাসনামলে তা' বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীহট্ট এখন শুধু সিলেট নামে আমাদের বাংলাদেশের একটি বিভাগ।

হযরত শাহজালালের ভারতে আগমনের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন— এই তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তখন ভারতে তুঘলক বংশের রাজত্ব চলছিল। দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। তার রাজত্বজাল ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তখন বংগদেশ শাসন করতেন সুলতান ইলিয়াস শাহ। তাকে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ নামে আখ্যায়িত করা হতো। তার শাসনকাল ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকান্দার শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শ্রীহট্ট এবং রাজা গৌরগোবিন্দ

পূর্বেই বলেছি যে, সেকালে ভারতবর্ষ ছিল ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। এই রাজ্যগুলির রাজারা প্রায় সকলেই ছিল স্বাধীন। তবে বৃহৎ রাজ্য কখনও কখনও ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আক্রমণ করতো, বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্য। হযরত শাহজালাল (রহঃ) সেকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেকালে শ্রীহট্ট ছিল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, এবং তা ছিল বংগদেশের অন্তর্গত। শ্রীহট্টের রাজার নাম ছিল গৌরগোবিন্দ। রাজার আকৃতি ছিল কদাকার। প্রকৃতি ছিল আরও কুৎসিত। তার কোনো লৌকিক পিতৃপরিচয় ছিল না। কথিত আছে, সে দেবতার ঔরসজাত সন্তান। পুরান গ্রন্থে জানা যায় কোনো কোনো দেবতা মর্ত্যের সুন্দরীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেহ-সংসর্গে লিপ্ত হয়। হিন্দুদের একাধিক দেবতার এই বদভ্যাসটি ছিল। তাদের পবন দেবতো পশুদেরও রেহাই দিতো না। অঞ্জনা নামের এক নারী পবনদেব কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে এক সন্তান প্রসব করে। তার নাম হনুমান। রামায়ণের রামভক্ত হনুমান সেই হনুমান। সেও একদল মানুষের পূজা পায়। হিন্দুদের পুরান-উপপুরান তো প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী। কিন্তু রাজা গৌরগোবিন্দ

ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইতিহাসের যুগে দেবতাদের অপকীর্তির কথা শোনা যায় না। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, গৌর-গোবিন্দ ছিল জারজ সন্তান।

কথিত আছে, শ্রীহট্টের এক রাজার বহু রানী ছিল। তন্মধ্যে এক রানী অবৈধ সন্তান গর্ভেধারণ করে। সেই গর্ভে যে সন্তানটির জন্ম হয়, তারই নাম গৌরগোবিন্দ। দেবতার দোহাই রাজার কাছে বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় পুত্রসহ রানীকে পরিত্যাগ করা হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গৌরগোবিন্দ বাহুবলে শ্রীহট্ট দখল করে নেয়। রাজা হয়ে সে পার্শ্ববর্তী আরো কিছু স্থান দখল করে নিয়ে তার রাজ্যের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। শ্রীহট্টের একটি টিলার উপরে ছিল তার রাজপ্রাসাদ।

রাজা গৌরগোবিন্দের জন্ম যেমন পঙ্কের মধ্যে, তার স্বভাব-চরিত্রও ছিল তদ্রূপ। সে ছিল অত্যাচারী, নিষ্ঠুর এবং ব্যাভিচারী। তার রাজ্যে অল্পসংখ্যক মুসলমান বসবাস করতো। হিন্দুদের কাছে মুসলমানরা ম্লেচ্ছ (নীচ জাতি) বলে অভিহিত হতো। তারা স্বভাবতই মুসলমানবিদ্বেষী। তার জের আজও বর্তমান। তাই গৌরগোবিন্দের রাজ্যে আজান দিয়ে নামাজ পড়া যেতো না। গো-হত্যা ছিল মহাপাপের কাজ। কেননা, গরু হিন্দুদের কাছে গো-দেবতা আর গাভী হলো গো-মাতা। শ্রীহট্টের মুসলমানরা বিভিন্ন নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করতো। কেননা, সংখ্যালঘু মুসলমানের পক্ষে হিন্দু রাজার কাছে সুবিচার পাওয়ার উপায় ছিল না। তাই মুখ বুজে সব অবিচার-অত্যাচার সহ্য করতে হতো।

রাজা গৌরগোবিন্দের শাসনকালে দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহের শাসন চলছিল। বংগদেশও মুসলমান সুলতানের শাসনাধীন। তবুও এদেশে মুসলমানগণ হিন্দু রাজশক্তি কর্তৃক অত্যাচারিত হতো। এর কারণ, প্রথমতঃ মুসলমান সর্বত্রই ছিল সংখ্যালঘু। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান শাসকেরা রাজ্যবিস্তারে যতোটা আগ্রহী ছিল, মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষায় ততোটা আগ্রহী ছিল না। তৃতীয়তঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধার অভাবে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অত্যাচারের খবর মুসলমান শাসকদের কর্ণগোচরও হতো না বলে মনে করা যেতে পারে।

বোরহান উদ্দিনের ঘটনা

গৌরগোবিন্দের শাসনামলে শেখ বোরহান উদ্দিন নামে একজন ধার্মিক মুসলমান শ্রীহট্টে বসবাস করতেন। তিনি বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি আল্লাহর দরবারে সন্তান কামনা করতেন সর্বদা। একদিন তিনি নামাজ পড়ে মোনাজাতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন:— হে আল্লাহ, আমি তোমার নামে কোরবানী মানত করলাম। করুণা করে আমাকে একটি সন্তান দান করো।

শেখ বোরহান উদ্দিন এবং তার স্ত্রী যখন পৌঢ় বয়সে উপনীত তখন আল্লাহর রহমতে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় তারা খুব খুশি হলেন। সহসা মনে পড়ে গেল মানতের কথা। আল্লাহর কাছে কেন, মানুষের কাছেও ওয়াদা করলে তা পালন করা ওয়াজেব হয়ে যায়। ওয়াজেব তরক করা মহা গুণাহের কাজ।

মানত করার সময়ে শেখ বোরহান উদ্দিন অগ্র-পশ্চাৎ ভাবেন নি। কিন্তু মানত আদায়ের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। হিন্দু রাজা গৌরগোবিন্দের রাজ্যে গরু জবাই করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। হিন্দুদের গো-দেবতার গলায় ছুরি বসায় এমন শক্তি তিনি কোথায় পাবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অতি গোপনে তিনি কোরবানী করবেন। মানত পুরা তাকে করতেই হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি নিজ বাড়ীতে অতি গোপনে গরু জবাই করে প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করলেন। গোস্ত কাটার সময়ে একটি খণ্ড এক চিল এসে ছো মেরে নিয়ে উড়ে গেল। চিলটা উড়তে উড়তে রাজবাড়ীর উপর দিয়ে যাচ্ছিল। সহসা তার মুখ থেকে গোস্তের টুকরা নীচে পড়ে গেল। রাজার লোকেরা তা দেখে তৎক্ষণাত রাজার কাছে গিয়ে বললো :— মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে। প্রাসাদের প্রায় কাছেই চিলের মুখ থেকে এক খণ্ড মাংস পড়েছে। মনে হয় গোমাংসই হবে। এখন কী আদেশ?

সংবাদ শুনে রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললো :— আমার রাজ্যে গো-হত্যা? এতো বড়ো পাপের কর্ম করতে কার দুঃসাহস হলো? যাও, খুঁজে

বের করো অপরাধীকে। ধরে নিয়ে এসো তাকে। পাপিষ্ঠকে কঠোর শাস্তি দেবো।

রাজার আদেশ পেয়ে সৈন্য-সামন্তরা বেড়িয়ে পড়লো গো-হত্যাকারীর খোঁজে। অবশ্য তারা নিশ্চিত যে, এটা মুসলমানের কাজ। কে সেই মুসলমান, তা-ই তারা খুঁজে বের করবে। তাই মুসলমান বাড়ীতেই তল্লাসী শুরু করা হলো। খুব বেশি সময় আবশ্যক হলো না। শেখ বোরহান উদ্দিনের বাড়ীতে গিয়েই তারা গো-হত্যার আলামত পেয়ে গেল। তখনই সৈন্যরা তাকে বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে চললো। রাজার কাছে পৌছে তারা বললো :— মহারাজ, এই সেই পাপিষ্ঠ যবন। এর নাম বোরহান উদ্দিন। এ-ই গো-হত্যাকারী।

রাজা গৌরগোবিন্দ শেখ বোরহান উদ্দিনের দিকে রোষ কষায়িত নেত্রে তাকিয়ে বললো :— রে পাপিষ্ঠা, কোন্ সাহসে তুই আমার রাজ্যে গো-হত্যা করেছিস? জানিস না যে, গরুকে আমরা দেবতা বলি, পূজা করি?

বোরহান উদ্দিন খুব বিনীতভাবে বললেন :— ওসব ছুতোয় কাজ হবে না। তুই ব্যাটা আমাদের ধর্মকে অবমাননা করবার জন্য এ কাজ করেছিস।

বোরহান উদ্দিন বললেন :— তা' নয়, মহারাজ। আমার সন্তানাদি ছিল না বলে আল্লাহর কাছে গো-কোরবানী মানত করেছিলাম। সম্প্রতি আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। তাই মানত আদায় করেছি। আমাদের ধর্মে বিধান আছে।

রাজা বললো :— ব্যাটা তোর ধর্মে বিধান থাকলে তাতে আমার কী? এটা হিন্দুর রাজ্য। এখানে যবন ধর্মের স্লেচ্ছাচার চলতে পারে না। তুই অমার্জনীয় অপরাধ করেছিস। শাস্তি তোকে পেতেই হবে।

রাজা জহলাদকে হুকুম করলেন বোরহান উদ্দিনের হাত কেটে দিতে এবং তার শিশুপুত্রকে এনে হত্যা করতে।

বোরহান উদ্দিন রাজার আদেশ শুনে বললেন :— মহারাজ, আপনার বিচার আমি মেনে নেবো। আপনি আমাকে হত্যা করবার আদেশ দিন। কিন্তু শিশু হত্যা করবেন না। দোষ হয়, তো আমিই করেছি। শিশুর কী দোষ?

রাজা বললো :—আরে ব্যাটা নির্বোধ, অই শিশুটাই হলো পাপের গোড়া। ওকে বাঁচতে দেওয়া যাবে না। আর, তোর শুধু হাতের অপরাধ হয়েছে, হাত দিয়ে গো-হত্যার মতো জঘন্য কর্ম করে। আমার বিচার সঠিক হয়েছে। তোর হাত কাটা যাবেই।

রাজার আদেশে বোরহান উদ্দিনের শিশু পুত্রটিকে নিয়ে আসা হলো। প্রথমে কর্তন করা হলো বোরহান উদ্দিনের হাত। তারপর তারই চোখের সম্মুখে তার শিশুপুত্রটিকে হত্যা করা হলো। কসাই তুল্য নির্মম রাজার কাছে বোরহান উদ্দিনের কোনো কাকুতি-মিনতি গ্রাহ্য হলো না।

রাজার এই নির্মম অত্যাচার কাহিনী রাজ্যের সকল মুসলমানের কর্ণগোচর হলো। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই তাদের করণীয় ছিল না। এ ঘটনার পর রাজ্যের মুসলমানরা আরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। এই মুসলমান বিদ্বেষী নিষ্ঠুর রাজার রাজ্যে মুসলমান প্রজারা কী করে তাদের ধর্ম রক্ষা করবে, সেটাই তাদেরকে আরও ভাবিয়ে তুললো।

গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান

শেখ বোরহান উদ্দিন পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ভাবছিলেন। কিন্তু সেই শক্তি তিনি পাবেন কোথায়? অবশেষে তার খেয়াল হলো যে, বংগদেশের সুলতান শাম্‌স উদ্দিন ইলিয়াস শাহের নিকট গেলে হয়তো একটা উপায় হতে পারে। তিনি এক সময়ে সুলতানের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি তার দুর্দশার কথা সুলতানের কাছে বর্ণনা করলেন। তার দুর্দশার কথা শুনে তিনি দুঃখবোধ করলেন এবং দুরাচার গৌরগোবিন্দের প্রতি তার ক্রোধের উদ্রেক হলো। তিনি তার পুত্র সিকান্দার শাহকে আদেশ দিলেন একদল সৈন্য নিয়ে শ্রীহট্টে গিয়ে অত্যাচারী রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে।

সিকান্দার শাহ একদল সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে শ্রীহট্ট অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাজা গৌরগোবিন্দ ভাবতেই পারেন নি যে, তাকে কেউ আক্রমণ করতে পারে। সিকান্দার শাহের সেনা সমাবেশ দেখে তার ভীতির সঞ্চার হলো। তাই সে একটা ফন্দি আঁটলো। তার সৈন্যদের বলা হলো সম্মুখে না

গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে অবস্থান নিয়ে মুসলমানদের সেনাদের উপরে তীর নিক্ষেপ করতে।

মুসলমান সেনা ছাউনীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। গৌরগোবিন্দের সেনারা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকায় তাদের দেখা যাচ্ছিল না। মুসলমান সেনারা পড়ে গেল বিপাকে। শত্রু সেনাদের লাগালে পাওয়া গেল না বলে পাল্টা আক্রমণের উপায় ছিল না। অদৃশ্য থেকে নিক্ষিপ্ত তীরে মুসলমান সেনারা আহত হচ্ছিলো। অবশেষে তারা দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। রাজা গৌরগোবিন্দের এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল।

শেখ বোরহান উদ্দিনের আশা পূর্ণ হলো না। তিনি এবার ভাবলেন যে, তাকে দিল্লীর বাদশাহর শরণাপন্ন হতে হবে। দিল্লীর বাদশাহর মর্জি হলে গৌরগোবিন্দকে তিনি উচিৎ শিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন। এবার তিনি দিল্লীতে বাদশাহর দরবারে গিয়ে গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। দিল্লীর বাদশা ফিরোজশাহ তুঘলক বোরহান উদ্দিনকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি গৌরগোবিন্দকে শায়েস্তা করবার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন।

ইতোমধ্যে বংগদেশের অন্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্তা আচক নারায়ণের বিরুদ্ধে দিল্লীর দরবারে অভিযোগ গেল যে, হিন্দু শাসনকর্তা আচক নারায়ণ তার মুসলমান প্রজাদের উপরে অত্যাচার করছে। এই উভয় মুসলমান বিদ্বেষীর বিরদ্ধে বাদশাহ সেনাপতি সিকান্দার গাজীকে এক বিপুল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধাভিযানে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। বাদশাহর আদেশ পেয়ে সেনাপতি তার বাহিনী নিয়ে বংগদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন আবহাওয়া অনুকূলে ছিলো না। তদুপরি রোগাক্রান্ত হয়ে সৈন্যরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লো। কিছু সংখ্যক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমতাবস্থায় কী করণীয় তা জানবার জন্য সেনাপতি সিকান্দার গাজী বাদশাহর কাছে পত্র পাঠালেন। বাদশাহ আরো কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ সেনাপতি নাসির উদ্দিনকে বংগদেশে সিকান্দার গাজীর সাহায্যের জন্য যেতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে তিনি সসৈন্যে সিকান্দার গাজীর সংগে মিলিত হলেন।

প্রকাশ থাকে যে, নাসির উদ্দিন ছিলেন পরহেজগার মুসলমান। তিনি হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মুরিদ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রা প্রাক্কালে তিনি তার পীরের দোয়া চাইতে গেলে, তার পীর হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার বাহিনীর সংগে বংগদেশে যাবার অভিমত ব্যক্ত করলেন। এভাবে তিনি বংগদেশে প্রবেশের সুযোগ নিলেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর সংগে গেলেন তার ৩৬০ জন সহচর।

রাজা গৌরগোবিন্দ এই যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে শংকিত হয়ে পড়লো। নাসির উদ্দিনের বাহিনী যথাসময়ে শ্রীহট্ট সীমান্তে এসে পৌঁছে গেল। রাজার সেনারা পাহাড়ের আড়াল থেকে তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করছিল। এবারে একটি তীরও মুসলমান সেনাদের শরীরে বিদ্ধ হলো না। বরং তীরগুলি ফিরে গিয়ে নিক্ষেপকারীকে বিদ্ধ করতে থাকলো। আল্লাহর ওলী সংগে থাকার কারণে এরূপ অলৌকিক কাণ্ড ঘটছিল।

রাজা গৌরগোবিন্দ এই অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। তার কাছে খবর পৌঁছে গেল যে, মুসলমান বাহিনীর সংগে একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ রয়েছেন। সুতরাং এবার মুসলমান বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তাই তাকেও কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

রাজা গৌরগোবিন্দ একটি বিরাটাকার ধনুক ছিল। সেটা ব্যবহার করার মতো কেউ ছিল না। রাজা ভাবলো, এই ধনুকের নাম ক'রে যদি একবার মুসলমান বাহিনীর সাধক পুরুষটিকে রাজধানীতে আনা যায়, তাহলে কৌশলে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা যাবে। তাকে হত্যা করা গেলে নিশ্চয় মুসলমানবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হবে।

রাজা গৌরগোবিন্দ শাহজালালের নিকট এই বলে দূত পাঠালো :— মহাশয়, জানিতে পারিলাম যে, আপনি একজন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সাধক পুরুষ। তাই আপনার সংগে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। যুদ্ধে উভয়পক্ষে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়াছি যে, আমার অস্ত্রাগারে একটি বিশেষ ধনুক আছে। আপনি যদি সেই ধনুকে 'জ্যা' পরাইয়া তীর নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে প্রমাণিত হইবে যে আপনি একজন সাধক পুরুষ। কেননা, এই ধনুকটিও সাধারণ ধনুক

নয়। তবে শর্ত থাকে যে, ধনুকে 'জ্যা' পরাইতে ব্যর্থ হইলে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে। যদি আপনি সত্যিকার সাধক হন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) দূতকে বললেন :— তোমার মহারাজের প্রস্তাবে আমি সম্মত। আমাদের মধ্যে আমি কেন, আরও অনেক সাধক পুরুষ রয়েছেন। আগামী কাল যে-কেউ গিয়ে তোমার মহারাজের ধনুকে জ্যাঁ পরিয়ে আসবেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ) সেনাপতি নাসির উদ্দিনকে বললেন :— তুমি একজন সেনাপতি। তাই এই বীরত্বের কাজটি তোমারই করা উচিত। তুমি কী বলো?

নাসির উদ্দিন বললেন :— হুজুর যেমন আদেশ করবেন, তেমনই হবে। যদি আমাকে দোয়া করেন, ইনশাআল্লাহ কাজটি আমি সমাধা করতে পারবো।

পরবর্তী দিন নাসির উদ্দিন রাজা গৌরগোবিন্দের রাজসভায় গেলেন। গিয়ে বললেন : মহারাজ, আপনার ধনুকের ছিলা পরাতে আমার উপর পীর সাহেবের আদেশ হয়েছে। তাই আমি এসেছি, এবার আপনাকে আপনার ধনুকটির কাজে যেতে আদেশ দিন।

গৌরগোবিন্দ বললেন :— তাহলে তোমাদের পীর সাহেব নিজে আসেন নি? তাহলে প্রাণদণ্ডের ভয় তারও আছে! আচ্ছা দেখা যাক, শিষ্যের ক্ষমতা কতো খানি।

পাত্রমিত্রসহ রাজা নাসির উদ্দিনকে নিয়ে অস্ত্রাগারে গেল এবং সেইধনুকটিতে 'জ্যা' পরাতে বললো। নাসির উদ্দিন ধনুকটি তাকিয়ে দেখার পর বললেন :— 'মহারাজ, ধনুকে ছিলা পরাতে না পারলে প্রাণদণ্ড হবে, তা জানি। কিন্তু ধনুকটি যদি ভেংগে যায়, তাহলে কী হবে?

রাজা বললো :— এই ভারী ধনুকটি ভেংগে যাবার বস্তু নয়। তবু যখন বলছো, তাই বলি— ছিলা পরাতে গিয়ে ধনুকটি যদি ভেংগেই যায়, তাতে তোমার কোনো দোষ নেই।

নাসির উদ্দিন বললেন :— তবু আগে সব কিছুর ফয়সালা করে নেওয়া ভালো। এবার আমি কাজে হাত দিতে পারি।

অতঃপর নাসির উদ্দিন 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে অবলীলায় ধনুকটি হাতে তুলে নিলেন। ধনুকের একপ্রান্তে চাপ দিয়ে যখন 'জ্যা' (ছিলা) পরাতে যাবেন, তখনই তা' বিকট শব্দ ক'রে ভেংগে দু' টুকরো হয়ে গেল। রাজা এবং পাত্র-মিত্র সবাই অবাক। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ নিরবতায় কাটানোর পর গৌরগোবিন্দ নাসির উদ্দিনকে লক্ষ্য করে বললো:— তোমার বীরত্ব দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। এবার তুমি তোমাদের শিবিরে ফিরে গিয়ে তোমার পীর সাহেবকে বলো, আমি আত্মসমর্পণ করবো। আগামী কালই আমি তার সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য তোমাদের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হবো।

নাসির উদ্দিন শিবিরে ফিরে এসে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কাছে আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। দু'টি কারণে, যথা— প্রথমতঃ আল্লাহর মর্জিতে নাসির উদ্দিনের সাফল্য, দ্বিতীয়তঃ গৌরগোবিন্দের বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণের অংগীকার। তিনি আল্লাহ তায়ালার শোক্‌রিয়া আদায় করলেন।

রাজা গৌরগোবিন্দের ঝোঁকের মাথায় যা-ই বলুক না কেন, পরে মত্ পরিবর্তন করলো। যবনের কাছে মাথা নত করা যাবে না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সে তার যাবতীয় ধনরত্ন এবং পরিবারবর্গ নিয়ে একটি দুর্ভেদ্য দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

দিন শেষ হয়ে আসে। কিন্তু মুসলমান শিবিরে গৌরগোবিন্দের আগমনের কোনো খবর নেই। অবশেষে হযরত শাহজালাল (রহঃ) রাজবাড়ীতে লোক পাঠালেন খবর জানার জন্য। প্রেরিত লোক রাজবাড়ী থেকে ফিরে এসে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-কে সংবাদ জানালো যে, রাজা প্রাসাদে নেই।

হযরত শাহজালাল বুঝলেন যে, গৌরগোবিন্দ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে না বলে আত্মগোপন করেছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কতিপয় মুরিদকে সংগে নিয়ে তিনি নিজেই গৌরগোবিন্দের বাড়ীতে যাবেন।

সিদ্ধান্ত অনুসারে হযরত শাহজালাল (রহঃ) কতিপয় অনুচরসহ রাজা গৌরগোবিন্দের বাড়ীতে গেলেন। গৌরগোবিন্দের বাড়ীতে গিয়ে পৌছার

পর নামাজের ওয়াক্ত হলে তিনি তার এক সহচরকে আজান দিতে বললেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা, আজানের সংগে সংগে গৌরগোবিন্দের সাততলা বিশিষ্ট প্রাসাদ ভেংগে পড়লো। সেই ভগ্ন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান আছে।

রাজা গৌরগোবিন্দ প্রাসাদের অদূরবর্তী দূর্গে বসেই তার প্রাসাদের দূরবস্থা দেখতে পেলো। সে ভাবলো, নিশ্চয় সেই মুসলমান ফকিরের অলৌকিক শক্তি আছে। নতুবা আজানের শব্দে আমার প্রাসাদ ভেংগে পড়বে কেন? এখন যদি এইভাবেই আমার দূর্গটিও ভেংগে পড়ে, তাহলে আমিও সপরিবারে মারা পড়বো। এমতাবস্থায় আমার আত্মসমপূর্ণ করা অথবা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ব্যতিরেকে তৃতীয় কোনো পথ দেখছি না। কিন্তু যবনের কাছে আত্মসমর্পণ অত্যন্ত অপমানজনক। আমি গো-দেবতার পূজারী। মুসলমানরা সেই গরুকে কেটে রান্না করে খায়। সেই ম্লেচ্ছ রাক্ষসের কাছে মাথা নত করার চাইতে মৃত্যুও শ্রেয়। তবু জীবনের প্রতি মোহ। তাকেও তো ত্যাগ করা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর দেখছি না। কিন্তু এখনও সেই যবন ফকিরটাকে চোখে দেখতে পেলাম না। যা হোক, একবার চোখের দেখা দেখতে হবে।

শ্রীহট্রে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখাতো। রাজা একদিন এক সাপুড়কে ডেকে বললো :— শোনো বাপু, তোমাকে মুসলমান সৈন্যদের শিবিরে গিয়ে সাপের খেলা দেখাতে হবে। তোমার একটা শূন্য ঝুড়ি থাকবে। সেই ঝুড়িতে আমি লুকিয়ে থাকবো। তুমি সাপের খেলা দেখাবে ঝুড়ি থেকে সাপ বের করে। আর আমি ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে থেকে সেই শিবিরের ফকিরকে দেখবো। এজন্য তোমাকে আমি উপযুক্ত পুরস্কার দেবো।

সাপুড়ে বললো :— আমি সম্মত আছি, মহারাজ। তবে কে সেই ফকির তা' আপনি চিনবেন কী করে?

রাজা বললো :— হয়তো দেখেই চিনতে পারবো। নচেৎ তুমিই একটা কৌশল করে ফকিরের পরিচয় জানতে চেষ্টা করবে। ফলত: আমারও চেনা হয়ে যাবে।

রাজার নির্দেশ মতো সাপুড়ের দল মুসলমান শিবিরে গেল সাপের খেলা দেখাতে। সিদ্ধান্ত অনুসারে 'রাজা একটি ঝুড়ির মধ্যে উঠে বসেছিল। সৈন্যরা খুব আনন্দের সংগে সাপুড়েদের সাপের খেলা দেখছিল। সাপুড়ে একটি ঝুড়ি বাদে সব ঝুড়ির সাপ বের করলো। কিন্তু একটি ঝুড়ি খুললো না। তার মধ্যে ছিল রাজা গৌরগোবিন্দ। সৈন্যরা আবদার জানালো সেইঝুড়ির সাপ দেখানোর জন্য। সাপুড়ে সরদার বললো : এই ঝুড়ির সাপটি খুব ভয়ঙ্কর। এখনও পোষমানানো যায়নি। ওটা দেখানো যাবে না। বের করলে বিপদ হবে।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে, সেই ঝুড়ির মধ্যে রাজা গৌরগোবিন্দ বসে আছে। তিনি ঝুড়ির কাছে গিয়ে বললেন, রাজা গৌরগোবিন্দ, লুকিয়ে থেকে আর কী হবে? আমি যে তোকে দেখতে পাচ্ছি। শীঘ্র বেরিয়ে আয়। নইলে তোর বিপদ ঘটে যেতে পারে।

গৌরগোবিন্দ এবার দারুণ ভয় পেয়ে গেল। ভাবলো, বাপরে এমন ফকিরের পাল্লায় পড়েছি যে, লুকিয়ে থাকারও উপায় নেই। অগত্যা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর সামনে এসে জোড়া হাতে দাঁড়িয়ে বললো : আমাকে ক্ষমা করুন।

শাহজালাল (রহঃ) বললেন:—তোকে ক্ষমা করাও অন্যায়। তুই ব্যভিচারী, অত্যাচারী। তুই মুসলমান প্রজার উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিস। তোর প্রজা বোরহানউদ্দিনের নিষ্পাপ শিশুপুত্রকে হত্যা করেছিস। গরু কোরবানী করছে বলে তার হাট কেটে দিয়েছিস। তোকে কী করে ক্ষমা করা যায়?

রাজা গৌরগোবিন্দ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হযরত শাহজালাল (রহঃ) বলতে শুরু করলেন :— কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা ইসলামের বিধান নয়। ইসলাম পর ধর্মকে হিংসাও করে না। তবে মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে সত্য ধর্মের বাণী পথভ্রষ্ট মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাখলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারো। আমি তোমাকে যা বললাম, সে সম্পর্কে ভাববার অবকাশ থাকলো। আর, তোমার অসৎ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।

পাপিষ্ঠ রাজা গৌরগোবিন্দ হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কাছ থেকে ফিরে এসে ভাবলো যে, এই ফকিরের সংগে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা যাবে না। আর, এরা এ রাজ্যে বসবাস করতে থাকলে সুখে রাজত্ব করা যাবে না। এমতাবস্থায় রাজত্বের মূল্য কী? সে আরও ভাবলো, নিজের রাজ্যে বাস করে পরগাছা মুসলমানের মর্জি-মেজাজের অধীন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। তার চাইতে বরং দেশ ত্যাগ করাই উত্তম।

অতঃপর শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দ তার পরিবারবর্গসহ কিছু ধনরত্ন নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল। কথিত আছে, পথিমধ্যে সে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়। আবার এ-ও কথিত আছে যে, সে আসামে প্রবেশ করে এক জংগলে আশ্রয় নেয়। সেখানে কুটির নির্মাণ করে দীনহীনভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। এভাবেই একসময়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যা-হোক, তার পতন ঘটেছিল , তা' ঐতিহাসিক সত্য।

আল্লাহর রহমতে প্রায় বিনা রক্তপাতেই শ্রীহট্ট বিজয় সম্ভবপর হয়েছিল। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর নামানুসারে শ্রীহট্টের নামকরণ হয় জালালাবাদ বর্তমানে সিলেট নামে পরিচিত এবং বাংলাদেশের অন্তর্গত।

শ্রীহট্টে রাজা গৌরগোবিন্দের পতনের সংগে সংগে সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো। সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা মুশ্‌রিক শাসকের অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পেলো। এখন আর তাদের ধর্মাচরণে কোনো বাধা থাকলো না।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) রাজ্য লোভী ছিলেন না। তিনি শুধু দ্বীনের খেদমতে থাকতে পছন্দ করতেন। তাই বিজিত শ্রীহট্টের শাসনভার সুলতান সিকান্দার শাহের উপরে অর্পণ করেন। তিনি তার মুরিদানদের নিয়ে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মুসলিম বিদ্বেষী অত্যাচারী-অনাচারী রাজা আচক নারায়ণ ও মুসলমানদের ভয়ে দেশ ত্যাগ করলো। তার রাজ্যটিও সিকান্দার শাহের শাসনাধীন হলো।

শ্রীহট্টে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর স্থায়ী বসতি স্থাপন এবং ইসলাম প্রচার

হযরত শাহজালাল (রহঃ) ভারতে আসেন রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং এসেছিলেন আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য। কিন্তু দৈবচক্রে তিনি যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের সংগে জড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু শাসন কার্যে জড়িয়ে যান নি। উল্লেখ্য যে, ভারতে আসার প্রাক্কালে তার মামার দেওয়া মাটির সংগে শ্রীহট্টের মাটির মিল খুঁজে পেয়েই তিনি এখানে স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করেছিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর আগমনের বহুপূর্ব থেকেই ভারতে মুসলমান বসতি স্থাপিত হয়। একদিকে মুসলিম শাসন, অন্যদিকে ইসলাম প্রচারক ওলিদের আগমনের ফলে ভারতে ইসলাম এবং মুসলমান অপরিচিত ছিল না। আর, ভারতে কতিপয় হিন্দুরাও বিভিন্ন সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। খাজা মঈনুদ্দীন (রহঃ) আগমনের পর দিল্লী এবং আজমীরের বহু হিন্দু ইসলামে সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাছাড়া ভারতের কিছু অংশ মুসলমান শাসকের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। তবুও সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে ভারতীয় হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল মুসলমানদের চাইতে অধিক। তাছাড়া ভারতে ছিল বহু রাজ্য। অনেকেই দিল্লীর সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতো না। যে সকল রাজারা মুসলমান সম্রাটকে কর (খাজনা) দিতো, তারাও সুযোগ পেলে বিদ্রোহী হয়ে কর দেওয়া বন্ধ করতো। আবার একজন রাজার রাজ্যে থাকতো আরও কয়েকজন ছোট রাজা। বড় রাজাকে কর দিতে বাধ্য থাকলেও তারা স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করতো। তাদের অধিকারভুক্ত এলাকায় তারা প্রজাদের উপর নির্বিবাদে অত্যাচার চালাতে সক্ষম ছিল। এরাও সুযোগ পেলে উর্ধ্বতন রাজাকে কর দিতে অস্বীকার করতো। এ রকমই ছিল তখনকার রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার।

হিন্দুরা সব সময় মুসলমানকে ভাবতো বহিরাগত। এই উড়ে এসে জুড়ে বসা মুসলমানকে তারা সহ্য করতে পারতো না। তদুপরি মুসলমানদের

প্রভাবে-প্রচারে হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতো বলে মুসলমানকে তারা শত্রু ভাবতো। অবশ্য মুসলমানরা জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করতো না। 'ধর্মে জবরদস্তি নেই'— কুরআনের বাণী। মুসলমান ধর্ম প্রচারকরা তা সর্বদা মনে রাখতেন। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, তারা এ ধর্মের আমল-আখলাক দেখে এবং মুসলিম ওলি-আউলিয়ার কারামত প্রত্যক্ষ করে এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতো।

মুসলমানদের আল্লাহ এক এবং সর্বশক্তিমান। তিনি নিরাকার। তার শরীর এবং অংগ-প্রত্যংগের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তার আহার-নিদ্রা সংসার-ধর্মপালনের আবশ্যক হয় না। তিনি 'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুদের বেদ-এর ভগবান বা ঈশ্বর এক। কিন্তু তার শক্তি আছে বলে মনে হয় না। কেননা, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং মহেশ্বর বা মহাদেব প্রলয়কর্তা। আবার যম প্রাণহরণের কর্তা। নরকের কর্তৃত্বও তার। স্বর্গের রাজা বা কর্তা ইন্দ্র। আর, নারায়ণ তার লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে অনন্তশয্যায় সম্ভবতঃ অনন্ত নিদ্রায় অচেতন। এদিকে মহাদেব ভাং-গাঁজা খেয়ে নদী-ভৃংদী নামের ভূত-পেত্নী নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত। স্বর্গে উর্বশী-মেনকারম্ভা নামের অপ্সরীরা (গায়িকা নর্তকীও বলা যেতে পারে) নাচে-গানে দেবরাজ ইন্দ্রকে আসক্ত রাখতে চাইলেও মর্ত্যের নারী অহল্যা তার কামুক দৃষ্টি থেকে রেহাই পায় না।

ভারতের জন্য তাদের ভগবানের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। তাই স্বর্গের দেবতারা যা-ই ঘটাক না কেন, ভারতকে রক্ষা করা তার চাই-ই। তাই গীতায় বলা হয়েছে :—

'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য এদাত্মানং সৃজম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

(হে ভারত, যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি।

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।)

অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে ভগবান যুগে যুগে ভারতে আসেন। মনে হয়, পৃথিবীটা ভারতেই সীমাবদ্ধ। আর, এ বক্তব্য শ্রীকৃষ্ণ নামের ভগবানের। তিনি প্রথমে ছিলেন বৃন্দাবনের গোপ-বালক। পরে হন মথুরার রাজা। তিনি ছিলেন বিবাহিত এবং পরকীয়াতেও আসক্ত। অবশ্য ভগবান হিসেবে তার পরকীয়া 'লীলা' (বৃন্দাবন লীলা) নামে আখ্যায়িত। তার পূর্বের ভগবান ছিলেন অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র। তিনি 'গীতা'র মতো কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ রেখে যাননি। কিন্তু তার প্রভাব ভারতে আজও বর্তমান। এখনও ভারতীয় হিন্দুরা মুসলমানদের মসজিদ ভেংগে রামমন্দির বানিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আদাজল খেয়ে লেগে আছে। বর্তমানে ভারতে মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলছে, তা পৃথ্বীরাজ—গৌরগোবিন্দ—আচক নারায়ণ—শিবাজী—রনজিত সিংহের নির্যাতনকে হার মানায়। বিহারে, কাশ্মীরে, অযোধ্যায়, গুজরাটে— কোথায় না মুসলমানরা মার খাচ্ছে? ভারতে এখন মাইকে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করবার পায়তারাও চলছে। তা'ও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সেকালে হিন্দু শাসনে মুসলমানরা কী শোচনীয় অবস্থায় বসবাস করতো। এমতাবস্থায় তাদের ধর্ম-কর্ম সঠিকভাবে পালন করবার সুযোগ ছিল না, তা' ধরেই নেওয়া যায়।

ভারতে মুসলমান শাসকরা সেকালে ধর্ম প্রচার করেনি ঠিকই, তবে তাদের একটা শক্তি ছিল। আর, সেকালে ধর্মপ্রচারক ওলি-আউলিয়ার মধ্যে ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি। তাওহীদবাদী মুসলমানরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না। মুসলমানদের আল্লাহর মধ্যে মানবিক দোষগুণের কোনো সংবাদ নেই। যুগে যুগে তাকে পৃথিবীতে আসতে হয় না। তার ক্ষমতাকে কয়েকজনকে ভাগ করে দিয়ে অনন্ত শয়নে থাকতে হয় না। আল্লাহ-ই একমাত্র Supreme Power-এর অধিকারী। ইবাদত (উপাসনা) একমাত্র তারই জন্য করতে হয়। অথচ ভারতের হিন্দুরা বহু ঈশ্বর-ভগবানের পূজাতেও তুষ্ট নয়। তার পক্ষে গরু এমনকি লিঙ্গ পূজাও

করতে হয়। তাদের 'ভগবান' শব্দটাই তো উভলিঙ্গ বিশিষ্ট। আল্লাহ মানুষকে সব কিছু দিতে সক্ষম। এ ধর্মে বিদ্যার জন্য দেবী, ধনের জন্য দেবী, শক্তির জন্য দেবী—এ সবের আবশ্যক হয় না। একমাত্র আল্লাহ-ই সর্বশক্তিমান। সব কিছু করার, সবকিছু দেখার, সবকিছু দেবার একমাত্র মালিক তিনিই। তিনি শুধু ভারতের নন, সমগ্র পৃথিবীর, আসমান-জমিনের সবকিছুর স্রষ্টাও তিনি, পালনকর্তাও তিনি।

আল্লাহ আদি মানব হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়াকে পয়দা করে পৃথিবী আবাদ করেছেন। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ এক আদমের বংশধর। মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলামের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন :—

'এক আদমের সন্তান সবে
সবাই সবার ভাই।'

ইসলামে আশরাফ (কুলীন)— আতরাফ (অ-কুলীন) বলে কোনো কথা নেই। অথচ একই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা একে অপরের ছায়া এবং ছোঁয়া সহ্য করতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ। ধর্মে-কর্মে তাদেরই অধিকার। আর অন্যান্য বর্ণের কেউ যুদ্ধ ক'রে দেশ ও মানুষকে নিরাপত্তা দেবে, কেউ ব্যবসায় ও কৃষিকাজ ক'রে অর্থের যোগান দেবে। আর সর্ব নিকৃষ্ট শ্রেণী শূদ্র নামে কথিত। তারা উচ্চ বর্ণের দাসত্ব করবে। এই বিভেদকে বৈধ করার জন্য তাদের শাস্ত্র তৈরী করতে হয়েছে। গীতায় রয়েছে সেই শাস্ত্রবাক্য :—

'চাতুর্বর্ন্যং ময়া সৃষ্টং গূণকর্ম বিভাগশঃ।'

(চারিবর্ণ (মানুষ) আমার সৃষ্টি, গুণ এবং কর্ম বিভাগ অনুসারে।)

তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সুতরাং তা' শিরোধার্য। তাই হিন্দু সমাজে আজও ব্রাহ্মণদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এ-ধর্ম কাউকে অন্য ধর্ম থেকে গ্রহণ করে না। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সমাজ থেকে বর্জন করতে পারে। ইসলাম ধর্মের সত্যতা, সততা, উদারতা এবং তাওহীদবাদের মাহাত্ম্য কাউকে বোঝাতে সক্ষম হলে, সে এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবেই। তা' আগেও হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তাই এদেশে ইসলামের মহত্ব যারা উপলব্ধি

করতে সক্ষম হয়েছে মনে-প্রাণে তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছে। আর, এ-ভাবেই ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে ধর্ম পালনে। হিন্দু শাসকরা মুসলমানদের ধর্মাচরণে বাধা দিয়েছে, যেমন শেখ বোরহান উদ্দিন গৌর-গোবিন্দের রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, গো-কোরবানী করে অত্যাচারিত হয়েছেন। হিন্দু রাজ্যে এরূপই হয়েছে সেকালে এবং এ কালেও হিন্দু ভারতে তদবস্থা। বরং অবস্থা আরও শোচনীয়। আবার কমজোর, ঈমানের মুসলমানরা বিশেষতঃ ধর্মান্তরিতরা কেউ কেউ পিছু টান ছাড়তে পারেনি। যদিও ধর্মান্তরিত হিন্দু সমাজে ঠাই পাবে না, তবুও তারা কিছু কিছু হিন্দু আচরণে আসক্ত থাকে। এমনটি আজও দেখা যাচ্ছে। ইহুদী-খ্রীস্টান, মুশরিকদের দেখাদেখি কতক দুর্বল ঈমানের মুসলমান বিধর্মীদের আচার-আচরণ অনুসরণ করছে। উদাহরণতঃ বলা যায়— মুসলমানদের জন্য নাচ,গান, মদ্য পান হারাম। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে হারামতো নয়ই বরং ধর্মের অংগ হিসেবে বিবেচিত। হিন্দুদের মন্দিরে, পূজা-পার্বনে গান-বাজনা, নাচ চলে, এমনকি মদ-গাঁজা সেবনও। ইহুদী খ্রীস্টানদের সমাজেও এ-সব নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু মুসলমানদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা তা' কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। মুসলমান ধর্ম প্রচারকরা শুধু মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেই ক্ষান্ত হননি। তারা ইসলাম ধর্ম-অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত বেশরাহ কাজও বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) শ্রীহট্টে স্থায়ী হয়ে তার মুরিদদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন। ওয়াজ-নসিহাত করে পথভ্রষ্ট এবং বিদ্‌আত অনুসারীদেরকে সঠিক পথে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কুরআন এবং হাদিসের বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। তার নসিহত শুনে পথভ্রষ্টরা সঠিক পথে ফিরে এসেছে। এভাবে সমগ্র বংগদেশে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন আজীবন। তিনি যেমন বহু বিধর্মীকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এনেছেন, তেমনি অনেক মুরিদ তার কাছে মারেফাত শিক্ষা করে কামেল ওলিতে পরিণত হয়েছেন। বংগদেশে যারা ইসলাম প্রচার করেছেন, তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য।

আল্লাহর অসীম রহমত— তিনি হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য ইসলাম প্রচারক সুফীসাধকেরা না এলে এতদঞ্চলে মুসলমানদের নাম-নিশানা থাকতো না। আর, তাহলে এদেশের মুশরিকরা এখানে অনায়াসে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতো।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কর্মময় জীবন এবং ইন্তেকাল

হযরত শাহজালাল (রহঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ মহাসাধক। তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য ওয়াজ-নসীহত করেছেন। তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা এবং খান্‌কা নির্মাণ করে বংগদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। পার্থিব জগতের কোনো ধন-সম্পদ এবং প্রতিপত্তির প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। দিন-রাতের অধিকাংশ সময় তিনি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তার অসংখ্য মুরিদদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত হাসিল করেছেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) ছিলেন ইসলামের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তিনি গোমরাহী এবং কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা এবং বাধা-বিঘ্ন তাকে তার সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বংগদেশের মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছে। তাই বহু মুশ্‌রিক তার কাছে এসে তাওহীদবাদী ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। বংগদেশে ইসলাম আবাদ হওয়ার পশ্চাতে তাঁর অবদান অপরিসীম।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার জীবনের শেষের দিকে তার মুরিদদের মধ্যে কতিপয় খলিফা নিয়োগ করে যান। ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেন। তারা পীরের আদেশ পেয়ে বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এভাবে ইসলাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার সুযোগ্য মুরিদদের অবদানও কম ছিল না। তার খলিফাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সৈয়দ নাসির উদ্দিন। তাই তাকেই তিনি গদীনসীন করে যান।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। শ্রীহট্টের বুকে তার দরগাহ শরীফের সন্নিকটে তার সমাধিগৃহ

বর্তমান আছে। আজও নিয়মিত বহু লোক তার মাজার জিয়ারতে আসে। তার ইন্তেকাল সম্পর্কে কথিত আছে যে, একদিন তিনি তার মুরিদদের সংগে নিয়ে সমাসীন ছিলেন। এক সময়ে এশার নামাজের ওয়াক্ত হলো। তিনি জামায়াতে নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর তিনি তার হুজরাখানায় প্রবেশ করেন। হুজরাখানায় প্রবেশের পূর্বে তিনি তার খাদেমকে বলে গেলেন যে, কেউ যেন তার হুজরাখানায় প্রবেশ না করে। তিনি মোরাকাবায় বসলেন। রাত শেষ হলো। ফজরের আজান শোনা গেল। কিন্তু হুজরাখানা থেকে তিনি বের হন না। মুরিদেরা তাই দরোজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করেন। ভিতরে প্রবেশ করে তারা দেখতে পান, তিনি মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। দেখা গেল যে, তার দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই। তার ইন্তেকালের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে মানুষ আসতে থাকলো তাকে এক নজর দেখার জন্য। সেদিন ছিল শুক্রবার— মুসলমানদের পবিত্র জুমার দিন। জুমার নামাজ-অন্তে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে তার নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাকে সমাহিত করা হলো। এভাবে ইয়ামেনে জন্মগ্রহণ কারী আল্লাহর এক খাস বান্দা শ্রীহট্টের মাটিতে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন। একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন, কার কোথায় মৃত্যু হবে এবং কখন আসবে সেই অন্তিম সময় তা তিনি ছাড়া আর কেই জানে না।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগাহ

শ্রীহট্টে যে স্থানে হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার মুরিদগণসহ আস্তানা গড়ে বসবাস করতেন; সেটাই দরগাহ শরীফ নামে খ্যাত।এখানেই তার মাজার। এখানে একটি সুন্দর এবং সুবৃহৎ মসজিদ রয়েছে। তারপর বহু বর্ষ অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু তার দরগাহ এবং মাজারের আকর্ষণ একটুও কমেনি। অদ্যাবধি মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তার দরগাহয় মানত করে। মানতের বস্তু প্রদানের জন্য দরগাহয় আসে। কেউ বা আসে পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে। কেউবা শুধু দর্শনেচ্ছায়ও এখানে এসে থাকে। মোটকথা, এখানে নিয়মিত লোকের ভিড় লেগেই আছে।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার দরগাহ্র কাছে একটি কূপ খনন করেছিলেন। এই কূপের পানিতে তিনি ওজু করতেন। এই কূপটির চারিদিক পাথর দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই কূপটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বারো মাস একই পরিমাণ পানি থাকে, কখনো বাড়ে-কমে না। কিছু লোক এই কূপের পানিকে পবিত্র মনে করে। কথিত আছে যে, এই কূপের পানি পান করে অনেকে কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছে। আজও রোগমুক্তির জন্য অনেকে এই কূপের পানি কলসী ভরে নিয়ে যায়। এমনকি, হিন্দুরাও রোগ মুক্তির জন্য এ পানি পান করে।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) বিবাহ করেন নি। তার মুরিদদের মধ্য থেকে একজন গদীনসীন হন। সম্ভবত: সেই বংশধারা থেকেই গদীনসীন হচ্ছেন। তা ছাড়াও বর্তমানে বহু ভক্ত জুটেছে, যারা দরগাহর খাদেম হিসেবে পরিচিত। এই দরগাহয় বছরে চারবার ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। ওরশের সময়ে বহু ফকির-দরবেশকে এখানে দেখা যায়। মুসলমানই শুধু নয়, বহু হিন্দুরাও এখানে নজরানা দেয়।

ওরশের সময়ে এখানে হিন্দুয়ানী কায়দায় মেলা বসে। মেলায় নারী-পুরুষ সকলেই আসে। গান-বাজনা, মদ-গাঁজা, জুয়ার আড্ডা কিছুই বাদ যায় না। এখানকার খাদেমরা বেশরাহ ফকির। এদের ইংগিতে এখানে অনেক বেশরাহ কার্যকলাপ চলে। হযরত শাহজালালের নামে লেখা বহু গান প্রচলিত আছে। মারেফতী গান গাইলে সওয়াব মিলে, এমন একটা ধারণা অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে এখনও রয়েছে। তাই নারী-পুরুষে সমস্বরে মারেফতী গান গায়। এ-রকম একটি গান :—

'তুমি রহমতের নদীয়া
দয়া করো মোরে হযরত
শাহজালাল আউলিয়া।'

এই গান যারা গায়, তারা জানে না যে, রহমত একমাত্র আল্লাহর এক্তিয়ারে। আর, এই 'নদীয়া' শব্দটা কী? 'নদীয়া' যদি নবদ্বীপ হয়, তাহলে নিশ্চয় এই শব্দে শ্রীচৈতন্যকে ইংগীত করা হয়েছে। তিনি হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকে বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে একদল সাধক

ফকির আছে। তারা নিজেদেরকে সুফীসাধক বলে পরিচয় দেয়। আসলে বৈষ্ণবদের সংগে তাদের খুব একটা তফাৎ নেই।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ঘোষণা করেছেন :— 'আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি এবং যাহারা উহা যথারীতি পাঠ করে, তাহারা অই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে; আর যাহারা উহা মানে না, তাহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'— সূরা বাকারাহ : ১২১। কুরআন পাকে আরও বলা হয়েছে :— 'আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছি, সে তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনায়, তোমাদিগকে পবিত্র করে, তোমাদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমাদিগকে এমন জিনিস শিক্ষা দেয় যাহা তোমরা পূর্বে জানিতে না।'— সূরা বাকারাহ : ১৫১।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মানুষকে কুরআনের কথা বলেছেন। আর মানুষের ইবাদত এবং প্রাত্যাহিক জীবনাচারের বিধান দিয়েছেন তার শরীয়তের মাধ্যমে। শরীয়ত বর্জন করলে আর মুসলমানীত্ব থাকে না। দরগাহ্‌র ফকিররা তো শরীয়তের ধার ধারে না। তারা গাছের গোড়া বাদ দিয়ে আগায় চড়ে বসলো কেমন করে। শরীয়তের হুকুম-আহকাম মেনেই তবে মারেফত স্তরে পৌঁছানো সম্ভব, নতুবা নয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্জন করা যায় না। গাছের গোড়া অতিক্রম না করে মইয়ের সাহায্যে হয়তো আগায় চড়ে বসা যায়, কিন্তু মইটি সরিয়ে নিলে কী হতে পারে? আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ)-এর বিধান এবং পথ উপেক্ষা করে যারা একেবারে মারেফতে পৌঁছতে চায়, তাদের আর মই পাওয়ার উপায় থাকবে না। ফকিরীমত ইসলাম সমর্থিত নয়। তাই বলাই চলে সিরাজসাই, লালন ফকির, হাছন রাজা, খালেক দেওয়ান, রজ্জব দেওয়ান-কাঙালিনি সুফিয়া প্রমুখদের সাধনা ইন্দ্রিয়ের সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সকল ফকির-ফকিরিনীরা নামাজ-রোজা ইত্যাদি শরীয়তী বিধান লংঘন করে সাধের একতারা বাজিয়ে লাফায় আর আধ্যাত্মিক গান গায়, তারা পথভ্রষ্ট। সে কালের পীর-আউলিয়ার দরগাহ্‌য় অধুনা যে সকল ফকির খাদেম দেখা যায়, তাদেরকে ভণ্ড বলা-ই সমীচীন। এদের খপ্পরে যারা পড়ে, তারা কিছু

অর্থ কড়ি হারায়তো বটেই, তাছাড়া মহামূল্য যে বস্তুটি হারায়, তার নাম ঈমান।

সেকালের কামেল পীর-আউলিয়ার দরগাহ এবং মাজার পবিত্র। কিন্তু অধুনা বেদ্‌আত ফরিকরা তাকে অপবিত্র করছে। তারা মুসলমানদের দ্বারা ইসলাম বিরোধী দরগাহ-পূজা, মাজার-পূজা করাচ্ছে। মানুষের চাওয়া-পাওয়া সবই আল্লাহর কাছে। দরগাহ্-মাজারের কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভন্ড পীর-ফকির থেকে সাবধান থাকা আমাদের একান্ত কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে, বেশরাহ্ ফকিরদের সুফিবাদে আর, হিন্দুদের বৈষ্ণববাদে বিশেষ তফাৎ নেই। এসব চাল-চলন ইসলামের ঘোর বিরোধী।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কারামত

একমাত্র আল্লাহ তায়ালা অসীম শক্তি এবং ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে দুনিয়ায় নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। কুরআন পাকে অল্প কয়েকজন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) এবং শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। তার পরে আর কোনো নবী -রাসূল দুনিয়ায় আসবে না। তিনি রেখে গেছেন আল্লাহর কিতাব আল্-কুরআন এবং তার প্রবর্তিত শরীয়াবিধান। তার বাণীকে বলা হয় হাদিস। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত দুনিয়ায় আল্লাহর আইন এবং নবীর শরীয়া বিধান জারী থাকবে। তা' থেকে যারা ফারাক হবে কিংবা ভুল পথে চলবে, তাদেরকে আল্লাহ-রাসূলের পথ বাৎলাবেন আলেম-ওলামারা। এজন্য তাদেরকে বলা হয়েছে নায়েবে রাসূল।

নবী-রাসূলদের যামানায় পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য নবী-রাসূলগণ কিছু অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন যাতে তারা নবী-রাসূলদের প্রতি আস্থাশীল হয়। যেমন মহানবী (সাঃ)-এর যামানায় কাফিররা নবী (সাঃ)-কে বলেছিল :—'তুমি যদি চাঁদকে দু'টুকরো ক'রে দেখাতে পারো, তবে তোমার কথার উপরে ঈমান আনবো।' মহানবী (সাঃ) আল্লাহর মর্জিতে হাতের ইশারায় চাঁদকে দু' টুকরো করে

দেখিয়েছিলেন। এই অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত। একে বলা হয় 'মোজেজা'।

কামেল পীর এবং ওলিদেরও আল্লাহ এরূপ শক্তি বা ক্ষমতা দিয়েছেন ঐ একই প্রয়োজনে। এই অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতাকে বলা হয় 'কারামত'। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর পূর্ববর্তী কামেল পীর-আউলিয়ার কারামত সম্পর্কে জানা যায়। তারও কারামত ছিল এবং পরবর্তী কামেল পীর-ওলীদেরও কারামত ছিল। তবে সেকালে তারা কারামত জাহির করতেন না। প্রয়োজনে কারামত দেখাতেন আল্লাহ তায়ালার মর্জিতে। আল্লাহর মর্জি না হলে এসব হয় না।

বর্তমান সময়ে আজমীরের খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর দরগাহ, সিলেটের হযরত শাহজালাল দরগাহ, বাগের হাটের পীর খানজাহান আলীর দরগাহ্ এবং আটরশি-দেওয়ানবাগ-এর দরগাহ-খান্‌কার গদীনসীন পীরদের অনেক কারামতের খবর পাওয়া যায়। শোনা যায়, দেওয়ানবাগের পীরের দরগাহ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'আত্মারবাণী' ভিজিয়ে পানি খেলে কঠিন ব্যাধি আরোগ্য হয়। এইসব কারামতের প্রত্যক্ষদর্শীর খোঁজ পাওয়া যায় না। তবে লোক মুখে এবং পত্র-পত্রিকায় এরকম খবর আসে :—

(১) আমি আব্দুল করিম (নামটা আমার বানানো)। দীর্ঘদিন যাবৎ গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগিতেছিলাম। ঢাকা মেডিকেলে গেলে ডাক্তার বলে—অপারেশন করিতে হইবে। আমি ভয় পাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসি। এক সময় আমার আত্মীয় বলিল, 'দেওয়ানবাগের পীরের বাড়ীর পত্রিকা 'আত্মারবাণী' ভিজাইয়া খাইয়া আমার কঠিন বাতের ব্যারাম আরোগ্য হইয়াছে। তুমিও তাহা খাইয়া দেখ।' আমি তাহাই করিলাম। অতঃপর আমার গ্যাস্ট্রিক আলসার আরোগ্য হইয়াছে।

(২) আমি সুফিয়া বেগম (এ নামটাও আমার বানানো)। আমার বিবাহের পর দশ বছর গত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সন্তানাদি হয় না। এজন্য শ্বশুর-শাশুড়ী আমাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না। শেষে স্বামীও অসন্তুষ্ট। এক সময়ে তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য উতলা হইতে দেখিয়া, চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এমন সময় আমার এক বিবাহিতা বান্ধবীর কাছে জানিতে

পারিলাম যে, তাহার ননদ দেওয়ানবাগী পীরের তদবীর লইয়া বিবাহের চৌদ্দ বছর পরে সন্তানবতী হইয়াছে। স্বামীকে এ-কথা জানাইলে সে আমাকে দেওয়ানবাগী হুজুরের কাছে নিয়া যায়। তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া তদবীর দেন। দেওয়ানবাগী হুজুরের তদবীরে যথাসময়ে একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তান লাভ করি। এখন আমি সুখেই আছি।

উল্লেখিত কাহিনী পত্রিকার পাতা থেকে নেওয়া, অবশ্য স্মৃতির সাহায্যে পুনর্লিখিত। তবে নাম দু'টো মনে না থাকার কারণে বানানো নাম ব্যবহার করতে হয়েছে। এ-ধরনের খবর পত্র-পত্রিকায় অনেকেরই পড়া থাকতে পারে। গ্রন্থ পাঠে আমরা জেনেছি যে, সেকালে পীর-ওলিদের কারামাত প্রদর্শনের কারণ ছিল দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে। কাউকে সন্তান হওয়ানো, মামলা জেতানো কিংবা লটারীতে টাকা পাওয়ানোর জন্য আল্লাহর ওলিরা কারামত দেখান নি। ওলিদের ইচ্ছায় কারামত হয় না। কারামত প্রকাশে আল্লাহর ইচ্ছা থাকতে হয়। খুনের আসামী দরবেশ সেজে পুলিশের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে থাকতে পারে হয়তো। কিন্তু পীরের কারামত তাকে রক্ষা করতে চায় না। কারামত অতো সস্তা নয়। আর, সকল ক্ষেত্রেই কারামত খাটানো যায় না। আল্লাহ যাকে সেই ক্ষমতা দেন, তিনিই কারামত প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। যিনি সক্ষম হন তিনি যত্র-তত্র কারামত প্রদর্শন করেন না।

ভণ্ডপীরদের একদল দালাল থাকে। এই দালালেরা ভেট-মানতের বখ্‌রা পাওয়ার লোভে কারামত তৈরী এবং প্রচার ক'রে। তাতে কিছু কিছু আহম্মক প্রতারিত হয়। ফলতঃ ভণ্ডদের আয়-নজরানা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তা থেকে দালালদের বখ্‌রা দিলে তাতে তাদের লোকসান কোথায়? বুদ্ধিমান মানুষ কখনও এসব ধোকায় পড়ে না। অবশ্য যাদের ঈমানী জোর নেই, তাদেরতো সুবুদ্ধি মাথায় খেলেই না।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) কামেল পীর ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেছেন প্রায় ৬২০ বছর পূর্বে। তার কিছু কারামতের ঘটনা প্রচলিত আছে। সেসবের প্রত্যক্ষদর্শী এখন পাওয়ার কথা নয়। সেগুলি গ্রন্থ নির্ভর। তা' থেকে কিছু কারামত এখানে তুলে ধরছি।

(এক)

একবার পানির প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার হাতের লাঠী দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। সংগে-সংগে সেখানে কুয়ার সৃষ্টি হয়ে পানিতে ভরপুর হলো। কথিত আছে, শ্রীহট্টের আবদুল ওহাব এবং মনসুর নামের দু' ব্যক্তি মক্কা শরীফে হজ্ব করতে যান। হজ্ব করার পর তারা কতিপয় আরব দেশ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের কাছে কিছু মুদ্রা ছিল। সেগুলি সংগে রেখে ঘোরাফেরা নিরাপদ নয় ভেবে তারা সেগুলি একটি কাঠের বাক্সে ভরে মক্কার জমজম কূপে ফেলে দিলেন। বাক্সের উপরে তাদের নাম খোদিত ছিল। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগাহর এক ব্যক্তি একদিন শ্রীহট্টের সেই কূয়ার মধ্যে একটি বাক্স ভাসতে দেখে তুলে নিলেন। বাক্সে নাম খোদিত দেখে তা সযত্নে রেখে দিলেন। অতঃপর ভ্রমণ শেষে আবদুল ওহাব এবং মনসুর দেশে ফিরে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগাহ এসে তাদের বাক্সটি পেয়ে যান। তারা বুঝতে সক্ষম হলেন যে, হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কারামতে এটা সম্ভব হয়েছে। তারা মূদ্রাগুলি দরগাহ্‌র কাজে ব্যয়ের জন্য দান করে দিলেন।

(দুই)

সুরমা এবং বরাক সিলেটের দুটি নদী। এক সময়ে নদী দুটি শুকিয়ে গিয়েছিল। লোকজন পানির অভাবে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। এই খবর হযরত শাহজালাল (রহঃ)-কে জানানো হলো। তিনি সংবাদ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রহমতে পীরের দোয়ার বরকতে নদী দুটি আবার পানিতে ভর্তি হলো। পীরের এই কারামত দেখে সেখানকার বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলো।

(তিন)

একদা হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার মুরিদবর্গকে নিয়ে মসজিদে বসে দ্বীনী আলোচনায় মশগুল ছিলেন। সহসা তার দৃষ্টিনিবদ্ধ হলো

গৌরগোবিন্দের একটি সুউচ্চ প্রাসাদের উপর। তিনি সহসা বলে ফেলেন, অত্যাচারী রাজা গৌরগোবিন্দের এ-প্রাসাদটি যদি ধ্বংস হয়ে যেতো, তাহলে পাপীর অত্যাচারের নিদর্শন আর থাকতো না। এ কথা বলার সংগে সংগে সেই প্রাদাসটি ধ্বসে পড়লো। এই ঘটনা তার মুরিদগণ দেখেছেন। আরো অনেকে রাজার প্রাসাদটি ধ্বংস হয়েছে দেখে এবং ধ্বংসের কারণ জানতে পেরে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর বোজর্গীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার মুরিদ হয়ে গেল।

(চার)

হযরত শাহজালাল (রহঃ) যখন তার জন্মভূমি ইয়ামেন-এ ছিলেন, তখনকার একটি ঘটনা এ রকম :

ইয়ামেনে বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মুরীদ হচ্ছিল। কাফের রাজা ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে যে, অধিকাংশ লোক যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে শাহজালালকে সিংহাসনে বসাবার দাবী উঠতে পারে; সুতরাং বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন এখনই জরুরী। তাই রাজা তাকে কৌশলে ডাকিয়ে এনে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। একদিন রাজা হযরত শাহজালালের কাছে লোক পাঠালো। রাজার প্রেরিত লোক তার কাছে গিয়ে জানলো যে, রাজা তাকে তলব করেছে। হযরত শাহজালাল (রহঃ) রাজ সভায় গেলে রাজা তাকে বললো :—হুজুর, আপনার প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে জেনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনার কাছে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

অতঃপর রাজার নির্দেশ মতো পরিচারক হযরত শাহজালাল (রহঃ)-কে এক গ্লাশ সরবত পান করতে দিলো। সেই সরবতে ছিল বিষ মিশানো। তিনি বিসমিল্লাহ বলে বিষ মেশানো সরবত পান করলেন। সরবত পানে তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না। কিন্তু তার সরবত পানের সংগে সংগে রাজার পেটে তীব্র বেদনা শুরু হয়ে গেল। ডাকা হলো রাজবৈদ্যকে। কিন্তু আরোগ্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। পেটের ব্যথায়ই রাজার মৃত্যু

হলো। রাজার পরামর্শকরা যারা আসল ব্যাপার জানতো, তারা অনেকেই এই অলৌকিক ক্ষমতাশালী হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করলো।

(পাঁচ)

হযরত শাহজালাল (রহঃ) যখন সেনাপতি নাসির উদ্দিন ও সিকান্দার গাজীর বাহিনীর সংগে শ্রীহট্ট অভিযানে যাচ্ছিলেন তখন রাজা গৌরগোবিন্দ নদী পারাপারের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা সুরমা নদীর তীরে উপনীত হলে হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার মৃগ চর্ম নির্মিত জায়নামাজ পানির উপর বিছিয়ে তাতে বসে নদী পার হয়ে গেলেন এবং অন্যান্যদের এভাবেই পার করে নিলেন। এটাও ছিল তার একটা কারামত। সেই জায়নামাজখানা জীর্ণাবস্থায় এখনও দরগাহয় রক্ষিত আছে।

(ছয়)

কথিত আছে, সেনাপতি নাসির উদ্দিনের ইন্তেকালের পর তাকে গোসল করিয়ে জানাজা অন্তে দেখা গেল যে, তার লাশ মুর্দার খাটে নেই। খোদিত কবরে শুধু খাটখানাকেই দাফন করা হয়। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কারামতিতে তার লাশ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানকার কবরে তার লাশ দাফন করা হয়েছে। তাহলে প্রমাণিত হয় যে, তার দু'টি সমাধি রয়েছে; তার একটি সিলেটে এবং অন্যটি দিল্লীতে।

(সাত)

একজন দস্যু সরদার হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কাছে এসে তার কারামতী ক্ষমতা দেখতে চাইলো। বলা হলো, (কারামত দেখাতে পারলে সে সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করবে। হযরত শাহজালাল (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন :— তুমি কী কারামাত দেখতে চাও?

দস্যু সরদার বললো :—আমি এখানে আসার সময়ে একটি থলেতে এক হাজার মুদ্রা রেখে এসেছি। সেইথলেটি এখনই চাই।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) বললেন :— আমার সেরূপ কোনো ক্ষমতা নেই যে, এখনই তা এনে দিতে পারি। তবে আল্লাহর মর্জি হলে অবশ্যই পাবে।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কথা শেষ হতেই একজন লোক দৌড়ে এসে ডাকাত সরদারকে একটি থলে দিতে চাইলো। সে তা গ্রহণ করতে রাজী না হয়ে বললো :— এ থলেটি আমার নয়।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) বললেন :— আগে গুণে দেখ হিসাবে মেলে কিনা। তারপর মন্তব্য করো।

ডাকাত সরদার থলেটি গ্রহণ করে গুণে দেখলো যে, থলেতে ঠিক এক হাজার মুদ্রাই রয়েছে। সে তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করলো।

(আট)

কথিত আছে যে, রাজা গৌরগোবিন্দের একটি কূপ ছিল। সেখানে যাদুর প্রভাবে রক্তস্রোত প্রবাহিত হতো। লোকজন তা দেখে ভয় পেয়ে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কাছে গেল প্রতিকারের আশায়। তিনি একমুষ্টি ধূলি আল্লাহর নাম নিয়ে হাতে নিয়ে তা কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। সংগে সংগে কূপের রক্ত পানিতে পরিণত হলো। যাদুকররা সুরমা নদীতে ডুবে মরলো। যাদুকৃত পশুরা তার দরগাহয় এসে ভিড় জমালো। তারা তার খিদমতে থাকতে চাইলে আল্লাহর মর্জিতে তারা পাখি এবং মাছে পরিণত হয়ে গেল। দরগাহ্‌র পুকুরে গজালমাছ সম্পর্কেও এরূপ কিংবদন্তী রয়েছে।

(নয়)

সিকান্দার গাজীর মাছ শিকারের বাতিক ছিল। সময় পেলেই তিনি নদীতে মাছ শিকার করতেন। একদিন নদীর গজালমাছ হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর কাছে সিকান্দার গাজীর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। বলে :— সিকান্দার গাজী বড়শীর টোপ ফেলে আমাদেরকে শিকার করছে।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) বললেন :— তোমরা টোপ না গিললেই পারো। তাহলে আর ধরা পড়বার ভয় থাকে না।

গজাল মাছ বললো :— ক্ষুধা লাগলে খাদ্যের লোভ কে ত্যাগ করতে পারে? ক্ষুধার সময়ে কেউ টোপ ফেললে খাদ্য ভেবে আমরা তা গিলবোই। আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য আপনি একটা উপায় করুন। হযরত শাহজালাল (রহঃ) গজাল মাছদের রক্ষা কল্পে দরগাহ্র পুকুরে আশ্রয় দিলেন। আজও সেই মাছের বংশধর দরগাহ্র পুকুরে রয়েছে। এ-মাছ কেউ খায় না। মরে গেলে দাফন করা হয়।

(দশ)

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর নিকট একদল লোক এসে জানালো:— হুজুর, আমাদের এলাকায় একটা দুষ্ট দেও (জ্বিন) থাকে। সে এলাকার লোকজন্দের উপর ভয়ানক অত্যাচার করছে। এটাকে জব্দ করতে না পারলে আমাদের স্বস্তিলাভের উপায় নেই। আপনি এর একটা বিহিত করুন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) সেই জিনকে হাজির করে জব্দ করলেন। এভাবে তিনি অন্যত্র আরও একটি জিনকে শাস্তি প্রদান করে এলাকাবাসীকে জিনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। এ জিনটির নাম ছিল দেওরাই। এই জিনের নামানুসারে দেওরাইল পরগনার নামকরণ হয়।

(এগারো)

একবার কতিপয় লোকজনের সংগে হযরত শাহজালাল (রহঃ) ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এলাকাটা ছিল মরুভূমি। পদব্রজে চলা ছিল দারুণ কষ্টকর। এমন সময় সেখানে উটের পাল নিয়ে কতিপয় উট ব্যবসায়ী এসে উপস্থিত হলো। কাফেলার ধনবান ব্যক্তিরা প্রতিটি উট বিশ আশ্রফী মূল্যে কিনে নিলেন। যাদের কাছে ঐ পরিমাণ আশ্রফী ছিল না তারা উট কিনতে সক্ষম হলেন না। এমতাবস্থায় কিছু সংখ্যক উট ক্রয়ের একটা ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থাটি এরকম :

তিনি একটি মাটির পাত্রে একটি আশ্রফী রেখে একখানা চাদর দিয়ে পাত্রটি ঢেকে রাখলেন। অতঃপর সেই পাত্রে হাত ঢুকিয়ে আশ্রফী

তোলেন। এভাবে কয়েকবার তুলতে লাগলো। প্রতিবারেই তার হাতে উঠে আসে বিশ আশ্রফী। যে কজনের উট কেনার সাধ্য ছিল না পরিমিত আশ্রাপী না থাকার কারণে, এভাবে তিনি তাদের জন্য উট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। তার সম্পর্কে এরূপ বহু কারামতের ঘটনা প্রচলিত রয়েছে।

আল্লাহর মর্জি হলে কামেল পীর-আউলিয়া প্রয়োজনে এরূপ কারামত দেখাতে পারেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ) এবং অন্যান্য পীর-আউলিয়ার কারামত সম্পর্কীয় ঘটনাবলীর কতোটা সঠিক কিংবা সবগুলিই সঠিক কিনা। তা' এখন প্রত্যক্ষভাবে জানার উপায় নেই।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর নসিহত

হযরত শাহজালাল (রহঃ) তার মুরিদগণকে বিভিন্ন সময়ে নসিহত করতেন। তাঁর অমূল্য নসিহত থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

(১) সর্বদা স্মরণ রেখো—আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা। তিনিই একমাত্র উপাস্য। আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছেই।

(২) আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ—আশরাফুল মখলুকাত। মানুষের মনে আঘাত দিয়ো না, মানুষকে ঘৃণা করো না।

(৩) নিজের দিল্‌কে কাবা মনে করো। দিল্‌কে পবিত্র রাখো। দিলের ময়লা দূর করতে না পারলে ইবাদত কবুল হয় না।

(৪) আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। সেই বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা ভালো-মন্দ বেছে নাও। তোমার ইচ্ছা এবং শক্তিকে সৎপথে পরিচালনা করো।

(৫) পূণ্যবান, সদাচারী ব্যক্তিরাই ঈমানদার। পূণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্যে থেকে ঈমানী জোর হাসিল করা যায়। তাই সর্বদা সৎসংসর্গে বসবাস করা উত্তম।

(৬) যিনি ঈমানদার তিনি মহা ভাগ্যবান। ঈমানের পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবেন, তিনি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হবেন এবং তার নৈকট্য লাভ করবেন।

(৭) মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করো না। এটা আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-এর অপছন্দ।

(৮) দীন-দুঃখীর প্রতি সদয় থেকো। অভাবগ্রস্তকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ধনরত্ন দেন, যাকে ইচ্ছা করেন না তাকে দেন না। যাকে আল্লাহ ধন-রত্ন দিয়েছেন; তার জন্য দরিদ্রকে দান করা অবশ্য কর্তব্য।

(৯) সর্বদা পাপ থেকে এড়িয়ে থেকো। পাপকে কখনও ক্ষুদ্র ভেবো না। হয়তো রোজ হাশরের বিচারক্ষণে তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপগুলি একত্র হয়ে একটা বৃহৎ পাপে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আর, সেটাই তোমাকে দোজখে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(১০) নেক কাজ যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তাকে উপেক্ষা করো না। হয়তো রোজ হাশরের বিচারক্ষণে তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেকীগুলি জড়ো হয়ে বৃহৎ নেকীতে পরিণত হয়ে যাবে এবং তা-ই তোমার বেহেশতে প্রবেশের উসিলা হয়ে যেতে পারে।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর কতিপয় মুরিদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এবার হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর অগণিত মুরিদের মধ্যে অনেকে কামেল ওলি হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদেরও অনেক কারামতের ঘটনা প্রচলিত আছে। এখানে তাদের কয়েকজনের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সৈয়দ নাসির উদ্দিন

সৈয়দ নাসির উদ্দিন ছিলেন বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর দেশ ইরাকের অধিবাসী। তিনি স্বদেশ থেকে দিল্লীতে এসে বাদশাহের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তার কর্মদক্ষতা দেখে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক তাকে সেনাপতি পদে উন্নীত করেন। শ্রীহট্টের অত্যাচারী শাসক রাজা গৌরগোবিন্দকে দমন করার জন্য তিনি

সসৈন্যে শ্রীহট্টে আসেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মুরিদ হন। শেষ জীবনে তিনি তার পীরের খেদমতে শ্রীহট্টে অবস্থান করেন এবং এখানেই তার ইন্তেকাল হয়। তার সমাধি সম্পর্কে দু'টি তথ্য পাওয়া যায়। কেউ বলেন, তার সমাধি শ্রীহট্টে এবং কেউ বলেন দিল্লীতে।

সিকান্দার গাজী

সিকান্দার গাজী ছিলেন বাদশাহ ফিরোজশাহ তুঘলকের ভাগ্নে। তাকে সেনাপতি ক'রে সেনাবাহিনীসহ শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। পরে নাসির উদ্দিন সসৈন্যে এসে তার সংগে যোগ দেন। শ্রীহট্ট বিজিত হবার পর তিনি এ রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর নির্দেশে ইসলামী বিধান অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন।

শাহপরান

প্রকাশ থাকে যে, শাহপরান ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর ভাগ্নে। মুরিদদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি তার মামার মতোই সংযমী এবং ত্যাগী ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় অনেক দূর অগ্রসর ছিলেন। তারও বহু কারামতের ঘটনা পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদিন তিনি দরগাহ্র কবুতর জবেহ করে খান। এতে হযরত শাহজালাল (রহঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন :— 'আমার কবুতর খেয়ে কমিয়ে দিলে?' শাহ পরান কবুতরের পালকগুলি এনে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সংগে সংগে তা' জীবন্ত কবুতরে পরিণত হলো। তাই দেখে হযরত শাহজালাল (রহঃ) তাকে বললেন :— তোমার আর এখানে আমার কাছে থাকার আবশ্যক নেই। তুমি পরগনায় গিয়ে আস্তানা গড়ো এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করো।

হাজী মোঃ ইউসুফ

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর প্রিয় খাদেম ছিলেন হাজী মোঃ ইউসুফ। তার বংশধরগণ আজও সিলেটে হযরত শাহজালালের দরগাহর খাদেম। হযরত শাহজালাল (রহঃ) ছিলেন চিরকুমার। সে কারণে তার দরগাহ্‌র কর্তৃত্ব হাজী মোঃ ইউসুফের এবং পরবর্তীতে তার বংশধরদের উপরে বর্তায়। দরগাহর কাছেই তার মাজার অবস্থিত।

হাজী খলিল

হাজী খলিল ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর এক জনপ্রিয় মুরিদ। ইনিও কালক্রমে কামেল ওলি হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। হাজী ইউসুফের মাজারের পাশেই তার মাজার অবস্থিত।

মোঃ জিয়াউদ্দিন

মোঃ জিয়াউদ্দিনও একজন অলৌকিক ক্ষমতাশালী কামেল ওলি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। যেখানে তার মাজার অবস্থিত সেখানে আরও চারজন ওলির মাজার রয়েছে। এজন্যে সেগুলি পাঁচ পীরের মাজার নামে পরিচিত।

শেখ আলী

শেখ আলী ছিলেন ইয়ামেন-এর শাসনকর্তার পুত্র। ইনি রাজ সিংহাসন, স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর সংগী হয়ে ভারতে আসেন। তিনিও কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মাজারের পাশেই তার মাজার অবস্থিত।

শেখ বোরহান উদ্দিন

শেখ বোরহানউদ্দিন শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। রাজা গৌরগোবিন্দ তারই শিশুপুত্রকে হত্যা করেছিল তার হাত কেটে দিয়েছিল। তিনি হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মুরিদ হন এবং কঠোর সাধনায় কামালিয়াত হাসিল করেন।

শাহ মদন

শাহ মদন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শ্রীহট্টের টিলা গড়ে তার মাজার অবস্থিত। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর আদেশে তিনি এখানে অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করতেন।

কামাল উদ্দিন

কামাল উদ্দিন শ্রীহট্টের চৌধুরী বংশের সন্তান। অল্প বয়সেই তিনি হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মুরিদ হন। ইনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যেখানে তার মাজার অবস্থিত, সেখানকার নাম কামালপুর। সম্ভবতঃ তার নামানুসারে এ-নামকরণ হয়েছে।

হায়দার গাজী

হায়দার গাজী হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর প্রিয় মুরিদদের মধ্যে একজন ছিলেন। সিকান্দার গাজীর মৃত্যুর পর তিনি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা হন। সোনারগাঁয়ে তার মাজার অবস্থিত।

জিন্দা পীর

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মুরিদদের মধ্যে জিন্দাপীরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার সঠিক নাম জানা যায় না। সিলেটের যে স্থানে তার মাজার অবস্থিত, তার নাম জিন্দাবাজার।

হোসেন শহীদ

হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মুরিদদের মধ্যে হোসেন শহীদ একজন কামেল ওলি ছিলেন। শহরের যে স্থানে তার মাজার অবস্থিত তার নাম হোসেন শহীদ মহল্লা।

সৈয়দ হোসেন

সৈয়দ হোসেন বিখ্যাত পীর ছিলেন। শহরের যে স্থানে তার মাজার অবস্থিত, সেখানকার নাম তারই নামানুসারে হোসেন মহল্লা রাখা হয়েছে।

শেখ খিজির দবির

শেখ খিজির খান দবির কামেল পীর ছিলেন। শহরের খান দবির নামক স্থানে তার মাজার অবস্থিত। তার নামানুসারেই সে স্থানের ঐরূপ নামকরণ হয়েছে।

দাদা পীর

দাদা পীরের আসল নাম জানা যায় না। তিনি খুব বিখ্যাত পীর ছিলেন এবং খুব অধিক বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাই সবাই তাকে দাদা পীর বলতেন। শ্রীহট্ট শহরের মোক্তার খাকী মহল্লায় তার মাজার অবস্থিত।

শাহ হেলিম উদ্দিন

শাহ হেলিম উদ্দিন হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর সংগে এ-দেশে আসেন। ইনি ইল্‌মে মারেফাতের উচ্চ দরোজায় উন্নীত হয়েছিলেন। সাবেক শ্রীহট্টের মৌলভীবাজার মহকুমার কানিহাটাতে তার মাজার অবস্থিত।

শাহ মখদুম

শ্রীহট্টের দপ্তরী পাড়ায় শাহ মখদুমের মাজার অবস্থিত। ইনি একজন কামেল ওলি ছিলেন। তার দু'জন সুযোগ্য মুরিদের মাজারও এখানে অবস্থিত।

সৈয়দ মুহাব্বত

সৈয়দ মুহাব্বত হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর সংগে শ্রীহট্টে আসেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর আদেশে শেরাপুর পরগনায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করেন। সেখানেই তার মাজার অবস্থিত।

রোকনউদ্দিন

রোকনউদ্দিন একজন কামেল পীর ছিলেন। তার বহু কারামত কথিত আছে। কুমিল্লার সরাইল নামক স্থানে তার মাজার অবস্থিত।

॥ সংযোজন ॥

সাদ্দামের পতনের প্রেক্ষাপট

অবশেষে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ইরাকের সাদ্দাম বাহিনী পর্য্যুদুস্ত। বুশ কথিত সাদ্দামের মারাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র-জীবাণু অস্ত্রের কোনো খবরই পাওয়া গেল না। কোথায় গেল তার বিশ্বস্ত এবং দুর্ধর্ষ রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী? তারও কোনো হদিস নেই। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল সাদ্দাম হোসেনের কোনো মারাত্মক অস্ত্র খুঁজে পায়নি। আর, আক্রান্ত হয়ে সাদ্দামও সেরূপ অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হননি। তাহলে ধরে নিতে পারি যে, তার সেরূপ কোনো অস্ত্রই ছিল না। ওটা ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিশ্ব সন্ত্রাসী মানবতার পরমশত্রু জর্জ ডব্লিউ বুশের একটা জঘন্যতম মিথ্যা অপ-প্রচার। আর, এই অপপ্রচারকে পুঁজি করে বুশ মুসলমানদের মক্কা-মদিনা শরীরের পরবর্তী পবিত্র ভূমি ইরাককে বিধ্বস্ত করে দিল। এই ইরাকে হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইমাম হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ), যারা ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশধর এবং পরমাত্মীয়, তাদের মাজার। এখানেই বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) অন্তিম শয়ানে নিদ্রিত আছেন। এই ইরাক আব্বাসীয় খলিফাদের, বিশেষতঃ খলিফা হারুন-অর-রশীদের গৌরবের ধারক-বাহক। বর্বর খ্রীস্টান— পবিত্র কুরআন বর্ণিত মুসলমানদের মহাশত্রু কবলিত সেই ইরাক। নরাধম ইয়াজিদ-হালাকু খাঁকে হার মানিয়েছে বর্বর জর্জ বুশ। তার বাহিনীরা ইরাকে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, ইয়াজিদ-হালাকুখাঁর ধ্বংসযজ্ঞ ম্লান হয়ে পড়েছে তার কাছে।

বুশ বাহিনীর আক্রমণে ইরাকে নিহত হয়েছে হাজার-হাজার নিরপরাধ পুরুষ-মহিলা-শিশু। সম্ভবতঃ ইরাকের সেনা-সদস্যদের চাইতে অধিক নিহত হয়েছে বেসামরিক জনতা। আর, সম্ভবতঃই বা বলি কেন? রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হলে উলু-খাগ্‌ড়াইতো দুর্দশা সইতে হয় সর্বাধিক। এটাই স্বাভাবিক। এই অপঘাত মৃত্যুতে ইরাকে জনসংখ্যার যা' ঘাট্‌তি হয়েছে তা' একদিন পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু ইরাকের যাদুঘর থেকে যে সকল পুরাকীর্তি

লুণ্ঠিত হয়েছে, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী অপহৃত হয়েছে, সেসব ঘাটতি কী দিয়ে পূরণ হবে? এককালে দিল্লীর বাদশাহী দরবার থেকে বিশ্ববিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন এবং মূল্যবান হীরা জহরত্ লুণ্ঠিত হয়েছিল। আর কোনো দিন তা দিল্লী দরবারের শোভা বর্ধন করেনি। বেনিয়া ইংরেজ কোম্পানী তাজমহলের শরীর থেকে যে সকল মহামূল্যবান পাথর চুরি করে নিয়ে গর্তের সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি আজও কালের এবং তাদের অপকর্মের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। যে-সকল লুটেরা-তস্কর এই জঘন্য কর্ম করে বিশ্বের বুক থেকে কীর্তি-কলাপ, অনন্য সম্পদ নষ্ট করেছে, সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে, কেউ তাদেরকে শাস্তি দিতে না পারলেও ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করেনি। তাদের অপকীর্তি নিয়েই রচিত হয়েছে ইতিহাসের কলংকিত অধ্যায়। তারা ইতিহাসের আবর্জনা, যার স্থান নোংরা ডাস্টবিনে। আজকে শক্তির অহংকারে মদ-মত্ত বুশ-ব্লেয়ার। তাদের সভ্যতা বিধ্বংসী আগ্রাসন এবং অকারণে নির্দোষ মানুষের রক্তে হোলিখেলা সৃষ্টি করেছে ইতিহাসে আরেকটি কলংকিত অধ্যায় যা কারবালা, হিরোশিমা-নাগাসাকির বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইরাকের সাম্প্রতিক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনে কে দায়ী? বিশ্বের আহম্মক অথবা মিথ্যাবাদীরা বলবে: সাদ্দাম হোসেনই দায়ী। কারণ?—বুশ বলেছে, সাদ্দাম হোসেন সন্ত্রাসী। তিনি মারাত্মক রাসায়নিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র রাখেন। কিন্তু কোথায় সেই সব অস্ত্র? বুশ তা খুঁজে পাবে না। পায়নি জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকেরাও। আসলে তো পুঁজিবাদী লোভী সাইলক বুশের ইরাকের তেল ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। সাদ্দাম হোসেন যতক্ষণ ইরাকের শাসন ক্ষমতায় থাকবেন ততক্ষণে বুশের খায়েস পূর্ণ হবে না। তাই মিথ্যে অজুহাত খাড়া করে বিপুল বিক্রমে ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। দু'বছর পূর্বে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে বোমা হামলায় ওসামা বিন লাদেনকে বিনা প্রমাণে দায়ী করে, তার আশ্রয়দাতা দেশ আফগানিস্থানকে বুশ দখল করে নেয়। আর, তারও বহু পূর্বে সৌদী আরব সরকারতো মার্কিনীদের বরণ করে এনেছে বর্গাকুটুম্বকে সাহায্য করবার নাম করে। সেই অবধি সৌদীতে আমেরিকার মাতব্বরী চলছে, চলবেও। এ-ভূত তার ঘাড়

থেকে সহজে নামবে না। বরং আমেরিকার মর্জিতে সৌদীতে জন্মগ্রহণ করেও ওসামা বিন লাদেন স্বদেশে ঠাই পেলেন না।

ইরাককে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে বুশ এখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলো। অতঃপর কী হতে পারে? যা হবে তার আলামত পাওয়া যাচ্ছে। সিরিয়া কেন সাদ্দাম এবং তার অনুসারীদের আশ্রয় দিয়েছে? লাগাও যুদ্ধ। ইরান, মিশর, সুদান, জর্দান, লিবিয়া, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান— কেউ নড়েছো কি মরেছো। কী অজুহাতে ঘায়েল করতে হবে, তা চাল বাজ বিশ্ব সন্ত্রাসী বুশের জানা আছে। সুতরাং বাঁচতে চাও তো সবাই বুশের গোদাপায়ে সালাম করো। আর, তেল-সোনা-গ্যাস, ইস্তক বেকার লেড়কা-লেড়কী যার যা আছে তার কাছে সোপর্দ করো, তাহলে অন্ততঃ আরামে খেয়ে ঘুমিয়ে বংশবিস্তারে কোনো অসুবিধা হবে না। অতএব, সাদ্দাম হতে চেয়োনা। হামিদ কারজাই হয়ে বুশের পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়তে থাকো—জনগণের ভোগান্তি হলেও তোমার চর্ব্যচূষ্য লেহ্য—পেয়, চাই কি মার্কিনী মেমের অভাব হবে না।

কে বলে সাদ্দাম হোসেন স্বৈরশাসক ছিলেন? তাকে বলি—কে অধুনা স্বৈর শাসক নয়? সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে যিনি ক্ষমতায় আসেন, তার সংগে নির্বাচিত সরকারের তফাৎ একটাই। তার স্বৈরশাসন চালাবার সময়কাল সীমাবদ্ধ থাকে। আর, কোনো দেশের স্বৈরশাসন সে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সেখানে বুশ-ব্লেয়ারের নাক গলার কোনো অধিকার নেই। অথচ তারা সেই অনধিকার চর্চাই করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ তাদের কাছে ঠুটো জগন্নাথ। কী আবশ্যক এই এডিশনাল প্রতিষ্ঠানটির? যে সকল মুসলমান দেশ মার্কিনীদের মুসলমান দেশ ধ্বংস এবং দখলে মার্কিনীদের সহায়তা করছে, তাদের মতো আত্মঘাতী নির্বোধ আর হয় না। (১৭-০৪-২০০৩ইং)

প্রসঙ্গ জাতিসংঘ

বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘের প্রয়োজন আছে কি? এক কথায় তার সাফ জবাব হতে পারে—'না'। জাতিসংঘ পোষা একদম বেহুদা খরচের ব্যাপার ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বাক্য আছে :—'কিং ওয়ার ক্রিয়তে ধৈন্বা যো নসূতে ন দুগ্ধ দা' অর্থাৎ কেন সেই ধেনু ক্রয়, যে বাচ্চাও দেয় না, দুধও দেয় না? এবার বাংলায় বলি—

যে গরু নয়কো হালী, কেন খাওয়াবো তাকে খড়-বিচালী? জাতিসংঘ প্রসঙ্গে এসব উক্তি অশোভন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রেক্ষাপট কোনো শোভন কথা যোগাচ্ছে না। তাই এসব বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আলেকজান্ডার-জুলিয়াস সিজার-মার্কএন্টনীর যুগে বলা হতো—'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা'। বাহু বলে দেশ জয়, দিগ্বিজয়ে বাহাদুরী ছিল সেকালে। তারপর মধ্যযুগে এসে তৈমুর লং, চেংগীস খান, হালাকু খান, নাদির শাহরা পরদেশ দখল এবং লুঠতরাজ ক'রে সুনাম অর্জন করেন নি। তারা যা করেছেন, তা' মধ্যযুগীয় বর্বরতা নামে আখ্যায়িত হয়ে তা' ইতিহাসে কলংকিত অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব-বিবেকের কাছে তারা বীরত্বের গৌরব লাভ করতে পারেনি। তারা কুড়িয়েছে ঘৃণা। তাদের হিংস্রতাকে কেউ বীরত্ব বলে আখ্যায়িত করে না।

অতঃপর যুগ বিবর্তনে বিশ্বে এলো বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতা। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত মানুষ আর গায়ের জোরে রাজ্য দখলের কথা ভাবে না। যার যথা দেশ, সেখানেই সে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এই গণতন্ত্র-সচেতন মানুষ সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী নয়। সাম্রাজ্যবাদ মানেতো পররাজ্যের প্রতি লোভ। আর তাতেই সৃষ্টি হয় রক্তপাত হিংস্রতা, ধ্বংস, অশান্তি। তবু এই আধুনিক সভ্য যুগে (১৯১৪ খ্রীঃ) শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীর কয়েকটি দেশ দু-দলে বিভক্ত হয়ে সেই রক্তক্ষয়ী বিধ্বংসী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এ যুদ্ধ পৃথিবীর

বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছিল। তারা এমন সব ভয়াবহ মারণাস্ত্র, আণবিক-পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, যদ্বারা সেই যুদ্ধে নরহত্যায় এবং মানব সভ্যতার স্মৃতি-সৌধ ধ্বংসে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। আজও সেইসব ভয়ংকর অস্ত্র তার হত্যা এবং ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের সকল দেশের নিরীহ মানুষ আতংকিত। তাদের রাতের ঘুম কখনও নির্বিঘ্ন হতে পারেনি। সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল অবশ্য গরু মেরে জুতো দানের ব্যবস্থা করে গেছেন— নোবেল-প্রাইজ ঘোষণা করে। মানবকীর্তি এবং মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র আবিষ্কার করে যে অপূরণীয় ক্ষতি তিনি করেছেন, তার পাপ প্রাইজ প্রচলন করে মোচনও হয় না, পুরণও হয় না। আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল এবং তার মতো বিজ্ঞানীরা মানবতার মহা শত্রু। তারা অনায়াসে হিরোশীমা-নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, কিন্তু গড়তে পারে না, উঁইয়ের ঢিবিও!

বিশ্ব যুদ্ধের ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা, গণহত্যার ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের কতিপয় মানুষ ভাবছিল, কী করে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেই ভাবনার ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই গঠিত হয় 'লীগ অফ নেশন'। এই সংগঠন যুদ্ধের বিপক্ষে এবং শান্তির পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকলেও, খুব বেশি সংখ্যক দেশ তার সদস্যভুক্ত হয়নি। ১৯৩৫ সালে শুরু হলো আবার বিশ্ব যুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের চাইতেও ভয়ংকরভাবে। এবার বিশ্ব শান্তির জন্য ভাবিত হলো আরো অধিক সংখ্যক মানুষ। তারা ভাবলো, লীগ অফ নেশন যুদ্ধ ঠেকাতে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না। আরো মজবুত সংগঠন আবশ্যক। তাই লীগ অফ নেশন বিলুপ্ত করে গঠিত হলো 'ইউনাইটেড নেশন্স অর্গানাইজেশন' (জাতিসংঘ)। কিন্তু হলে কী হবে বিশ্বের অশান্তি সৃষ্টিকারী পরাশক্তি সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া-আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স-চীন হয়ে বসলো জাতিসংঘের পালের গোদা। লম্পটের প্রহরায় সতীত্ব—বেড়ালের প্রহরায় দুগ্ধ থাকলে কী হতে পারে বাস্তবে? যা হবার তা-ই হতে থাকলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাংগা-গড়ার মধ্যে ধ্বংস হলো ইসলামী খেলাফত, জার্মানী বিভক্ত হলো দুই দেশে। ফিলিস্তিন ভেংগে সৃষ্টি হলো অবৈধ ইহুদী

রাষ্ট্র ইসরাইল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে—তার মুসলিম প্রধান অংশের নামকরণ হলো পাকিস্তান। ভারতের কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দারাবাদ ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যগুলিকে সেখানকার জনগণের ইচ্ছাধীন রাখা হলো। জনগণের ইচ্ছানুসারে তারা ভারতে কিংবা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারবে। হায়দারাবাদ-জুনাগড় জবরদখল করে নিলো ভারত। কাশ্মীরে শতকরা আশি ভাগ মুসলমান বসবাস করলেও, কাশ্মীরের হিন্দু রাজা নিজের ইচ্ছায় ভারতে যোগদান করলো। সেখানে শুরু হলো সংঘাত। জাতিসংঘ ফয়সালা দিলো—কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেখানে গণভোটে নির্ণীত হবে কাশ্মীর ভারতে থাকবে, না পাকিস্তানের থাকবে। কিন্তু সুদীর্ঘ ৫৫ বছরেও জাতিসংঘ কাশ্মীরে গণভোটের ব্যবস্থা করতে পারেনি। লাগাতার হত্যা এবং বিতাড়ণের ফলে কাশ্মীরে আজ মুসলমানদের সংখ্যা ৪৫%- এ দাঁড়িয়েছে। তারপরও গণ হত্যা তথা মুসলিম নিধনযজ্ঞ এখনও অব্যাহত।

জাতিসংঘ অবৈধ দখলদারীত্বে সৃষ্ট ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলকে তড়ি-ঘড়ি স্বীকৃতি দিয়ে দিলো। তাদের উড়ে এসে জুড়ে বসতে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু ফিলিস্তিনের স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানরা অর্ধ শতকেরও অধিককাল ধরে আজাদীর সংগ্রাম চালিয়েও জাতিসংঘ কিংবা অন্য কোনো দেশ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি। এই তো কিছুকাল পূর্বে দখলদার ইসরাইলী সেনারা ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করে সেখানকার মুসলমান নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে হত্যা করেছে। ঘর-বাড়ি ভেংগে চুরে বুলডোজার দিয়ে মাটির সংগে মিশিয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘ তার প্রতিকার করতে পারে নি। ইসরাইল শক্তিধর, তাই তার উপরে তার মাতব্বরী অচল। অথচ অসহায় ফিলিস্তিনী মুসলমানরা নিরুপায় হয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলায় বাধ্য হলে তা জাতিসংঘের চক্ষে অপরাধ বলে গণ্য হয়। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে কেন স্বীকৃতি পায় না? কারণ, অধিবাসীরা মুসলমান এবং ইহুদী ইসরাইলীদের দখল টার্গেটে রয়েছে। অথচ পূর্ব তিমুরের সাড়ে আট লাখ খ্রীস্টান অনায়াসে মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়ে গেল।

ভিয়েতনামে চলেছে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ। ইরিত্রিয়া, সাইপ্রাস, লেবানন, বসনিয়া, চেচনিয়া, হার্জোগোবিনা— কোথায় না যুদ্ধ চলেছে? অতঃপর আফগানিস্থানে, তারপর ইরাকে সর্বনাশা যুদ্ধ। জাতিসংঘের ভূমিকাতো কোথায়ও যুদ্ধ বিরোধী মনে হচ্ছে না। এ সব দেখে-দেখে মনে হচ্ছে, জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার 'আলাদীনের যাদুর চিরাগ' নয়। বরং তা' আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স, বিশেষ করে আমেরিকার প্যাণ্ডোরাস্ বক্স (Pandora's box)। এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, পরাশক্তির কোপে পতিত দুর্বল দেশকে জাতিসংঘ কোনো আশ্বাসের বাণী শোনাবে না। সাহায্য-সহযোগিতাতো দুরের কথা। আমেরিকা চেয়েছিল আফগানিস্তানের তালেবান সরকার উৎখাত করতে, আরবীয় ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে এবং তার জিহাদী দল আল-কায়েদাকে ঘায়েল করতে, তাই আমেরিকার টুইনটাওয়ারে বোমা হামলায় দোষারোপ করা হলো লাদেনকে আর আর আশ্রয়দাতা তালেবান সরকারকে। জাতিসংঘ আমেরিকার পক্ষে আফগানিস্থানের তালেবান সরকারের প্রতি হুলিয়া জারী করলেও, আমেরিকার বুশকে বলেনি—'উপযুক্ত প্রমাণ না পেয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধাভিযান চালানো যাবে না'। আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধে তালেবান সরকারের পতন ঘটলো, উত্থান ঘটলো নতজানু হামেদ কারজাইয়ের সরকারের।

অতঃপর টার্গেটে এলো ইরাক। ইরাকের শাসক সাদ্দাম কার কী ক্ষতি করেছে? তার যদি কোনো রাসায়নিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র থেকেই থাকে, তাতে আমেরিকার বুশের অতো মাথা-ব্যথা কেন? তারপরও জাতিসংঘের নির্দেশ—'সাদ্দাম হোসেনের অস্ত্র-কারখানা পরিদর্শন করতে দিতে হবে'। সাদ্দাম সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেনি। অস্ত্র পরিদর্শন শুরুও হয়ে গিয়েছিল। পরিদর্শকদের একদফা রিপোর্টও জাতিসংঘে গিয়ে ছিল— 'ইরাকে এখনও কোনো মারাত্মক অস্ত্রের সন্ধান মেলেনি। অস্ত্র পরিদর্শনের সময় আরো বাড়ানো হোক।' কিন্তু মার্কিনী যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী জর্জ ডব্লিউ বুশ জাতিসংঘের তোয়াক্কা না করে সাদ্দাম হাসেনকে সময় বেধে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে বললো :—'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তুমি সপুত্রক ইরাক ত্যাগ করো,

নতুবা ভয়ংকর যুদ্ধ হবে।' বুশকে এই নির্দেশ জারী করবার অধিকার কে দিয়েছে? জাতিসংঘের কি তাতে মৌন সম্মতি ছিল? এখন বলতে বাধা কী:— 'কৃষ্ণ' তুমি কার? তুমি কি 'রাধা'র একার, না গোপীদেরও?

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বশান্তি হননকারী আমেরিকার জর্জ ডব্লিউ বুশ তার দু'চারজন দোসর নিয়ে দেশে-দেশে যুদ্ধ, রক্তপাত, ধ্বংসলীলা চালাবে, নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে চলবে, ধ্বংস করবে মানব সভ্যতা— এটা কি জাতিসংঘ এবং তার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি মেনে নেবে? যদি মেনে নেয়, তাহলে এই জাতিসংঘের কী আবশ্যক ছিল? বলতে চাই, ইরাকে অন্যায় যুদ্ধ, অবৈধ এবং অনধিকার দখলদারিত্ব, গণহত্যা, ধ্বংস এবং লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধে (যেহেতু তা' অমার্জনীয়) জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং তার সহচরদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হোক। তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হোক। নতুবা এ জাতিসংঘের কোনো প্রয়োজন নেই। বিশেষত: মুসলিম দেশসমূহের পক্ষে তো বটেই।

(২০/০৪/২০০৩ইং)